দেবীর আহ্বান

**ওঁ ভূঃ ভুবঃ স্বঃ ভগবতি দুর্গা পরিবার গণসহিতে ইহাগচ্ছ ইহাগচ্ছ ইহতিষ্ঠ ইহসন্নিধেহী, ইহ সন্নিরুধ্যস্ব
অত্রাধিষ্টানং কুরু, মমপূজাং গৃহাণ। ওঁ স্থাং স্থীং স্থিরো ভব, যাবৎ পূজা করোহং মমঃ।
ওঁ আগচ্ছ মদগৃহে দেবী অষ্টাভি সক্তিভি সহ। পূজাং গৃহাণ বিধিবৎ সর্বকল্যাণকারিনি।**

***Om bhuh bhubha swah bhagavati Durga paribar gana sahitey
Ihagaccha I, hagaccha, ihatistha, ihatistha, ihasannideahi, iha sannirudhaswa,
Atradhistanam kuru, mamapuja grihan | Om stham shthim sthirobhava, jabat puja karoham
mama || Om agaccha madgrihey debi ashtabhih shaktibhi saktibhi saha |
Pujan grihana bidhibat sarbakalyana karini ||***

*Oh Goddess Durga come with your family, sit down, get attached, stay close to us, settle down as
long I worship you. Come in my house Oh Durga, with all your eight powers,
I will worship in the prescribed way, Oh the well-wisher of all.*

দেবীর ঘোটকে আগমন

ছত্রভঙ্গস্তুরঙ্গমে
ফল : ছত্রভঙ্গ
দোলায়াং মড়কং ভবেৎ
ফল : মড়ক

দেবীর দোলায় গমন

কার্যকরী কমিটি ২০১৮-২০২০

**BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY &
BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR
TORONTO**

Bangladesh Canada Hindu Cultural Society
&
Bangladesh Canada Hindu Mondir

Executive Committee 2018-2020

Name	Designation
Bijit Roy	President
Sajal Deb	Vice President
Borendra Sanyal	General Secretary
Biswajit Mitra	Assistant General Secretary
Satyabrata Purkayastha	Finance Secretary
Nobarun Dey	Assistant Finance Secretary
Mrityunjoy Saha (Pappu)	Office Secretary
Taposh Deb	Cultural Secretary
Imon Das	Assistant Cultural Secretary
Dilip Kumar Saha	Organizing Secretary
Palak Datta	Secretary, Project Management
Ajoy Banik	Secretary, Puja Management
Sujit Das (Subodh)	Secretary, Prosad Management
Deepika Ghosh	Secretary, Puja and Vogh Management
Dr. Ashis Das	School Secretary
Bikash Ghosh	Secretary, Property Management
Razib Chandra Ghosh	Secretary, Youth Affair
Benoy Majumder	Director
Moyna Das	Director

Board of Trustees (BOT) 2016-2020

Name	Designation
Rajat Paul	Chairman
Ajoy Das	Member
Anil Nath	Member
Ashok Debnath	Member
Sabyasachi Chowdhury (Jishu)	Member
Debobrata Dey (Tomal)	Member
Nirmal Kar	Member
Deb Kumar Sarma	Member
Ramapada Paul (Mintu)	Member
Bijit Lal Roy	Member
Borendra Sanyal	Member
Satyabrata Purkayastha	Member

Executive committee 2016-2018
President: Shebu Chowdary
General Secretary: Arun P. Paul

Executive committee 2014-2016
President: Shubhash Roy
General Secretary: Borendra Sanyal

Executive committee 2012-2014
President: Shubhash Roy
General Secretary: Chanchal Saha

Executive committee 2009-2011
President: Nirmal Kumar Kar
General Secretary: Shubhash Roy

Executive committee 2007-2009
President: Arun Datta
General Secretary: Ramapada Paul

Executive committee 2005-2007
President: Anil Nath
General Secretary: Samir Lal Datta

Executive committee 2004-2005
President: Ajoy Das
General Secretary: Debobrata Dey (Tamal)

Executive committee 2003-2004
President: Anjan Datta
General Secretary: Debobrata Dey (Tamal)

Executive committee 2002-2003
President: Shebu Chowdary
General Secretary: Sudip Shome (Rinku)

Executive committee 2001-2002
President: Kirit Bikram Sinha Roy
General Secretary: Sabyasachi Choudhury

Executive committee 2000-2001
President: Sudip Dey (Anju)
General Secretary: Bijit Roy

Executive committee 1997-2000
President: Alok Choudhury
General Secretary: Kishore Chowdury

Executive committee 1996-1997
President: Swadesh Saha
General Secretary: Bibekananda Talukder

Executive committee 1994-1995
President: Sudhangshu Datta (Suda)
General Secretary: Bibekananda Talukder

Puja Mandap
16 Dohme Avenue, Toronto
ON M4B 1Y9
Phone: (416) 693-4444

পুরোহিতবৃন্দ
শ্রী প্রসাদ ব্যানার্জি
শ্রী শ্যামল ভট্টাচার্য্য
শ্রী মিটন পারিয়াল

সূচিপত্র

আস্তিক ও নাস্তিক	জয়দেব রায় চৌধুরী	১৩
বিজয়া: বিরহ বেদনার নয়	চিদানন্দ গোস্বামী	১৬
আনন্দ ও গৌরবের ঋগ্বেদের মাহাত্ম্য	ড. দিলীপ চক্রবর্তী	১৭
মহাঋষি বিশ্বামিত্র ও গায়ত্রী মন্ত্র এবং জপ	দেব কুমার শর্মা	১৮
বৈষ্ণবাচার্যগণের দার্শনিক মত ও ভক্তি-সাধন পদ্ধতি	স্বামী সুন্দরানন্দ	২১
সঠিক উচ্চারণে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পাঠ	বুলবুল ভৌমিক	২২
যুব-সমাজের প্রতি সম্ভাষণ (চতুর্থ ভাষণ)	ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী	২৬
শ্রীশ্রী রামঠাকুর	অরুনাংশু হোর	৪০
বৈষ্ণব	মৈত্রেয়ী চৌধুরী	৪৩
গুরু-শিষ্য পরম্পরা	ননীগোপাল দেবনাথ	৪৪
পুরীতে জগন্নাথের নবকলেবর	সুব্রত দাশগুপ্ত	৪৬
FEMALE DIVINITY IN HINDUISM	Dr. Sourendra K. Banerjee	৪৯
ছেলেবেলার দুর্গাপূজা-কিছু স্মৃতি কিছু বেদনা	ভগীরথ মিশ্র	৫০
ছবিমুড়া-উনকোটি-জম্পুই পাহাড়-ডুম্পুর লেক	সন্দীপন মজুমদার	৫২
নারী-পুরুষের সমন্বিত কর্মোদ্যোগে সার্থক হবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো	হরপ্রসাদ সেনশর্মা	৫৫
শ্রীমদ্ভগবদগীতা: সমাজে অপরাধ প্রবণতা ও তার প্রতিরোধের উপায়	বিদ্যুৎ মজুমদার	৫৬
সর্বস্ব দিয়েও কী পেলেন বিদেশিনী নিবেদিতা	শংকর	৬২
দুঃখ নাশের আরাধনা	সুমন গুপ্ত	৬৬
মহাজগতের অন্তরালে থাকা মহাশক্তিই হচ্ছেন জগদ্ধাত্রী	অরূপ ভট্টাচার্য	৬৯
কবিতাঞ্জন		
মা	আশা রানী দেবী	৭০
সূর্যমুখী	পূরবী পাল	৭০
পূজা ভাবনা	–	৭১
Student of Durga Puja	–	৭৭
বাউল	স্বামী পরমানন্দ	৮৪
গায়ক ভক্ত কবি রজনীকান্ত সেন	প্রণব কুমার মিত্র	৮৫
চিত্রে শারদীয় উৎসব কার্যক্রম	–	৮৯
তন্ত্রের দেবী কালী	দূর্বা বাগচী	১১৩
জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই	আবীর মুখোপাধ্যায়	১১৪
অবধূতের দর্শনে চব্বিশ গুরু : অথচ এঁরা কেউই কানে মন্ত্র দিলেন না	জয়ন্ত কুশারী	১১৮
আমেরিকায় শারদোৎসব	আলোলিকা মুখোপাধ্যায়	১১৯
যাঁদের স্মৃতি ও কীর্তির স্মরণে	–	১২২
ভুতুড়ে কণার কীতি আবিষ্কার ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি রহস্যের নতুন আশা	সুজয় চক্রবর্তী	১২৩
ভগিনী নিবেদিতা ও স্বামীজীর শেষবেলা	স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ	১২৬
বেদ রহস্য	অরবিন্দ	১২৮
বিজয়া দশমীর মাহাত্ম্য	জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৩০
আমরা সনাতনী	ড. কাঞ্চন পুরোহিত	১৩১
বিবেকানন্দের প্রাণপ্রিয় বেলুড় মঠ ঃ শিবভূমি মুক্তিতীর্থ	স্বামী দেবেন্দ্রানন্দ	১৩২
রীতিনীতি-আচরণে দুর্গাপুজার সেকাল ও একাল	গৌরী দে	১৩৪
ছিয়াশিতেও যেন তরতাজা যুবক আজও সমান কর্মোদ্যোগী মণি ভৌমিক	নিমাই দে	১৩৬
সৌভাগ্যমদগর্ব এবং মানভঞ্জন করে শ্রীকৃষ্ণ রাসলীলায় প্রেমে লীলাময়	চিদানন্দ গোস্বামী	১৩৮
অমৃতবাণী		
অমৃতকথা	স্বামী ভূতেশানন্দ	১৪০
আকাঙ্ক্ষা	শ্রীশ্রী আনন্দমূর্তি	১৪১
আবরণ	গোপীনাথ কবিরাজ	১৪২
ঈশ্বর	শ্রী অর্চনাপুরী মা	১৪৩
গীতায় জন্মান্তর রহস্য	মহর্ষি প্রেমানন্দ	১৪৪
গেরুয়ার সাইনবোর্ড	স্বামী শিবানন্দগিরি	১৪৫
গুরু	স্বামী অশোকানন্দ	১৪৬
চেতন, অবচেতন ও অধিচেতন	স্বামী বিবেকানন্দ	১৪৭
জপ ও ধ্যান	অযাচক	১৪৮
প্রার্থনা কেন করি	শ্রী অরবিন্দ ও শ্রীমা	১৪৯
পুরুষ ও প্রকৃতি	মহানামব্রত ব্রহ্মচারী	১৫০
বিষ্ণুহরি, কৃষ্ণহরি ও ব্রহ্মহরি	স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংস	১৫১
The Statement of `Advocacy Group ...	Sree Mahadev Chakravarty	১৫২
ওন্টারিও প্রদেশের স্কুল পর্যায়ে আন্তর্জাতিক ...	শ্রী মহাদেব চক্রবর্তী	১৫৩
Bangladesh Minority Rights...	হিমাদ্রী রায় সঞ্জীব	১৫৪
Chikungunia	Prof. Khokan Kanti Das	১৫৫

Convenor : Borendra Sanyal

Publishers : Bangladesh Canada Hindu Cultural Society, Toronto
Bangladesh Canada Hindu Mandir, Toronto
16 Dohme Ave., Toronto, ON. M4B 1Y9
Phone: (416) 693-4444

Published Date : October 2018

Cover : Mahua
Phone: (416) 319-7345, Toronto, Canada

Graphics & Printing : Sufala Printers
49/4-A R K Mission Road
Dhaka-1203, Bangladesh
Cell: +880 1715 295843
Email: sufala.printers@gmail.com

বি: দ্র: এ সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধ, অন্যান্য লেখা ও মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার: সকল কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার পেছনে যাঁরা আমাদের আর্থিক, কায়িক, নৈতিক এবং সার্বিক সমর্থন দিয়েছেন ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি জানাই কৃতজ্ঞতা।

বিশেষ কৃতজ্ঞতায় :
শ্রী মহাদেব চক্রবর্তী
ড. দিলীপ চক্রবর্তী
শ্রী কিরীট বিক্রম সিংহ রায়
বিশেষ সহযোগিতায় :
শ্রী সনৎ কুমার মল্লিক, বাংলাদেশ

BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY &
BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR
TORONTO

শারদীয় দুর্গাপূজা ২০১৮ উপলক্ষে
নির্বাহী কমিটির নিবেদন

কালের নিয়মে আমরা হারিয়ে ফেলেছি বাংলা বছর ১৪২৪ এবং বরণ করেছি ১৪২৫ সালকে। সেই একই নিয়মে আমরা আবার সমবেত হয়েছি মা দুর্গার আহ্বানে। প্রতি বছরের মতো এবারও আমরা ধর্মীয় ভাব-গাম্ভীর্যের এবং যথাযর্থ আচার আনুষ্ঠানিকতার মাধ্যমে ১৪ই অক্টোবর থেকে ১৮ অক্টোবর পর্যন্ত মায়ের পূজা-অর্চনার জন্য সমাজের সকলকে নিয়ে সমবেত হচ্ছি বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দিরে। এই মহামিলন এক মহা-আনন্দঘন মহোৎসব। দেবীর আগমন, আরাধনা, পুষ্পাঞ্জলি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ইত্যাদি এই মহোৎসবের কিছু আবেগ ঘন মুহূর্ত ও আনুষ্ঠানিকতা। কিন্তু এই মহোৎসবের আসল প্রাণ হচ্ছেন আমাদের তথা মন্দিরে আগত ভক্তবৃন্দ। মন্দিরের নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে আমাদের ভক্তবৃন্দের কাছে প্রত্যাশা, আপনারা প্রতি বছরের মতো এবছরও সপরিবারে এবং সবান্ধবে আমাদের সকল আনুষ্ঠানিকতায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ ও সহযোগিতা করবেন। এ প্রতিষ্ঠান আপনাদের সকলের। আপনাদের সার্বিক সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া আমরা একেবারেই অচল।

পরিশেষে, আমাদের শারদীয় দুর্গাপূজায় যে সকল ভক্তবৃন্দ, স্বেচ্ছাসেবক বৃন্দ, প্রতিষ্ঠানসমূহ এবং আমাদের শুভাকাঙ্ক্ষীরা বিভিন্নভাবে সহায্য ও সহযোগিতা করেছেন তাঁদের সকলকে নির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও শ্রেণিমত বিজয়ার শুভেচ্ছা জানাই।

বিনীত
নির্বাহী কমিটি
বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির
টরন্টো, কানাডা।

**BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY &
BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR
TORONTO**

শারদীয় দুর্গাপূজা ২০১৮ উপলক্ষে
বোর্ড অব ট্রাস্টির নিবেদন

সুধী ভক্তবৃন্দ,

বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দিরের পক্ষ থেকে সবাইকে শ্রেণিমত আমাদের ভালোবাসা, শুভেচ্ছা ও প্রণাম জানাই। এই মন্দির আপনাদের সকলের প্রতিষ্ঠান। এর উত্তরোত্তর উন্নতিকল্পে আমরা সর্বদা সচেষ্ট। এর পরিচালনার দায়িত্বে এবং সক্রিয় অংশ গ্রহণ আমরা একান্তভাবেই কামনা করি। আমাদের প্রত্যাশা রইল, আপনারা আগামী নির্বাহী কমিটিতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করবেন। এছাড়া আপনাদের সুচিন্তিত মতামত ও কর্মপরিকল্পনা আমাদেরকে অবগত করবেন। এই প্রতিষ্ঠানকে যেন আমরা সবাই এক অনন্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারি।

পরিশেষে মা দুর্গার কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন আমাদের সকলের অন্তরের আসুরিক প্রবৃত্তি দমন করে সেখানে জাগিয়ে তোলেন সকলের প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা ও মহামিলনের অনুভূতি এবং সমাজের সকল স্তর থেকে হানাহানি, ঘৃণা, হিংসা, বিভেদ এবং সকল অমঙ্গল দূর করেন।

বোর্ড অব ট্রাস্টির পক্ষ থেকে মন্দিরের সকল শুভানুধ্যায়ী, সেচ্ছাসেবী ও ভক্তবৃন্দকে তাদের অবদান ও অনুদানের জন্য জানাই আন্তরিক ধন্যবাদ ও শারদীয় শুভেচ্ছা।

"সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বেসন্তু নিরাময়াঃ।"

বিনীত
বোর্ড অব ট্রাস্টি
বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির
টরন্টো, কানাডা।

DURGA PUJA – 2018 SUB COMMITTEES

CO-ORDINATION COMMITTEE

1. Deb Kumar Sarma
2. Nirmal Kar
3. Anil Nath
4. Ajoy Das
5. Sabyasachi Choudhury (Jishu)
6. Ashoke Debnath
7. Debobrota Dey (Tomal)
8. Ramapada Paul (Mintu)
9. Rajat Paul
10. Sajal Deb
11. Biswajit Mitra
12. Dilip Saha
13. Ratan Roy
14. Dilip Halder
15. Rajesh Pramanik
16. Dr. Ashis Das
17. Shebu Chowdary
18. Chanchal Saha
19. Bijit Roy
20. Borendra Sanyal
21. Satyabrata Purkayestha
22. Jhantu Debnath
23. Produth Chakrabarty
24. Uttam Roy

SUB-COMMITTEE:
PRASAD MANAGEMENT SUB-COMMITTEE
Convenor: Sujit Das (Subodh)

1. Anil Nath
2. Sajal Deb
3. Sabyasachi Choudhury (Jishu)
4. Rajesh Pramanik
5. Asit Dutta (Pulak)
6. Liton Ghose
7. Mrityunjoy Saha (Pappu)
8. Dilip Saha
9. Mayna Das
10. Ashoke Dutta
11. Bikash Das
12. Apu Das
13. Taplu Das
14. Kinku Das
15. Nakul Dey
16. Sanjoy Ghose
17. Chapal Routh
18. Benoy Majumder
19. Kazal Roy
20. Gokul Biswas
21. Paplu Das
22. Ramanuj Bhowmik
23. Anirudda Bhadra (Omi)
24. Sunil Roy
25. Nikhilesh Roy
26. Rajib Roy
27. Rajib Ghosh
28. Subash Sarkar
29. Badal Ghosh

FINANCE SUB-COMMITTEE
Convenor: Satyabrata Purkayestha

1. Nobarun Dey
2. Deb Kumar Sarma
3. Ajoy Das
4. Shyamal Sarker
5. Sabyasachi Choudhury (Jishu)
6. Chayan Das
7. Sujit Das
8. Dilip Haldar
9. Biswajit Dey
10. Matilal Deb
11. Pradip Saha
12. Nirjhendu Shankar Mitra
13. Anup Roy
14. Sudip Purkayastha

BHOG AND RITUAL SUB-COMMITTEE
Convenor: Dipika Ghose

1. Chapala Nath
2. Sukla Nath
3. Shubarna Das
4. Biva Roy
5. Krishna Dey
6. Borna Dutta
7. Tulsi Paul
8. Mita Saha
9. Ira Dutta
10. Anita Sarkar
11. Chaynika Dutta
12. Sanchita Roy
13. Nobonita Choudhury
14. Aparna Banik

CULTURAL SUB-COMMITTEE
Convernor: Taposh Deb

1. Imon Das
2. Anup Sengupta
3. Himangshu Sarkar (Tinku)
4. Shubra Sheuli Saha
5. Uttam Roy

PUBLICATION SUB-COMMITTEE
Convenor: Borendra Sanyal

1. Bimal Chowdhury
2. Sujit Das
3. Nirmal Kar
4. Bijit Roy
5. Chanchal Saha
6. Satyabrata Purkayastha
7. Mrityunjoy Saha (Pappu)
8. Subal Saha

PUJA MANAGEMENT SUB-COMMITTEE
Convenor: Ajoy Banik

1. Prosad Banerjee
2. Asha Lata Banerjee
3. Shyamal Bhattacharjee
4. Miton Parial
5. Ira Dutta
6. Anita Sarkar
7. Aparna Banik
8. Rajesh Pramanik
9. Bikash Ghosh
10. Utpal Debnath
11. Dilip Saha
12. Aparna Agarwal
13. Sukla Debnath
14. Champa Dutta
15. Usha Saha
16. Abhishak Agarwal
17. Apurba Agarwal

BANGLADESH CANADA HINDU CULTURAL SOCIETY & BANGLADESH CANADA HINDU MANDIR TORONTO

আহ্বায়কের নিবেদন

আমাদের চিন্ময়ী শারদীয় সংখ্যা শুধু একটি বাৎসরিক প্রকাশনা নয়, বরং এর চেয়ে অনেক বেশি। আমরা অব্যাহতভাবে চেষ্টা করি এর জ্ঞানগর্ভ বিষয়বস্তুর মাধ্যমে বিভিন্ন সনাতন ধর্মের রচনাবলিকে সহজে আপনাদের হাতে তুলে দিতে। বিভিন্ন মনীষীদের বিভিন্ন রচনাবলিকে এবং তাদের উপদেশাবলি সহজে আপনাদের হাতের নাগালের কাছে নিয়ে আসাও আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। বর্তমান যুগে বিভিন্ন ব্যস্ততা ও যান্ত্রিকতার মাঝে আমাদের হাতে খুব একটি সময় থাকে না বিভিন্ন গ্রন্থাবলি পাঠে মনোনিবেশ করার। অথচ আমাদের প্রাচীন মনিষীদের মূল্যবান দর্শন ও মূল্যবোধ আমাদের জীবন বোধকে কতটা সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে সে বিষয়ে আমাদের উপলব্ধি বোধ একেবারেই কম। আমাদের চিন্ময়ী সে দিক থেকে অনেকটাই সহযোগিতা করতে পারে।

চিন্ময়ীতে আমরা বিভিন্ন বিষয় সংযোজিত করি। এখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যক্তির অভিব্যক্তি যেমন থাকে তেমনি সেখানে আমাদের উত্তর প্রজন্মের পূজা ভাবনাকেও আমরা স্থান দিয়ে থাকি। এর পেছনে আমাদের সকলকে অন্তর্ভুক্তির একটা প্রচেষ্টা থাকে। এছাড়াও আমরা চিন্ময়ীতে বেদ, উপনিষদ, দেব-দেবী, সনাতনী বিষয়াদি ও প্রথা, মনীষীদের জীবনী, ধর্মীয় স্থান ইত্যাদি বিষয় সংযোজন করে থাকি। ফলে আমাদের জীবনযাত্রার সঙ্গে উল্লিখিত বিষয়বস্তুর একটা তুলনামূলক প্রভাবকে কাজে লাগাতে পারি এবং মূল্যায়ন করতে পারি।

অধিকন্তু আমাদের মন্দিরের শুভাকাঙ্ক্ষী ও সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে আমাদের শ্রদ্ধেয় ভক্তগণ সহজেই তাদের সেবাসমূহ সম্পর্কে অবগত হন। এক কথায় আমাদের এই শারদীয় চিন্ময়ীর প্রয়োজনীয়তা অফুরন্ত। এর মাধ্যমে আমাদের আন্তঃযোগাযোগ ব্যবস্থাও উন্নত ও সহজ হয়। উদাহরণস্বরূপ আমাদের সমাজের অনেকের ফোন নম্বর। এই চিন্ময়ী প্রকাশ অনেক কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ। এর সঙ্গে যে সকল শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিগণ যুক্ত থাকেন তাঁরা ছাড়া অন্যের পক্ষে সেটা উপলব্ধি করা কঠিন। এই প্রকাশনী সফল করার পিছনে যে সকল ব্যক্তিগণ অবদান রেখেছেন তাঁদেরকে আমি আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও বিজয়ার অগ্রিম শুভেচ্ছা জানাই। এই প্রকাশনীতে যাঁরা বিজ্ঞাপন দিয়েছেন, যাঁরা লিখেছেন এবং কোনোভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলকেই জানাই মন্দিরের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও বিজয়ার শুভেচ্ছা।

পরিশেষে মা দুর্গার কাছে সমাজের সকলের সুস্থতা ও সর্বাঙ্গীণ মঙ্গল কামনা করে শেষ করছি।

বিনীত
বরেন্দ্র সান্যাল
আহ্বায়ক, চিন্ময়ী শারদীয় সংখ্যা ২০১৮
বাংলাদেশ কানাডা হিন্দু মন্দির
সার্বিক সহযোগিতায়
বিমল চৌধুরী

PRIME MINISTER · PREMIER MINISTRE

October 14–18, 2018

Dear Friends:

I am pleased to extend my warmest greetings to the members of the Bangladesh-Canada Hindu Cultural Society and the Bangladesh-Canada Hindu Mandir as you celebrate Durga Puja.

Durga Puja is one of the most important festivities in the Bengali Hindu calendar. This joyous occasion brings family and friends together to commemorate the victory of good over evil, and to celebrate peace, hope and self-renewal. It also provides a wonderful opportunity to recognize the tremendous contributions Canadians of the Hindu faith have made to our country in all fields of endeavour.

Diversity is our greatest strength. This celebration stands as a reminder that Canada is a nation made stronger not in spite of our differences, but because of them.

Please accept my best wishes for good health and prosperity, now and in the years to come.

Sincerely,

The Rt. Hon. Justin P. J. Trudeau, P.C., M.P.
Prime Minister of Canada

Ontario

Premier of Ontario - Premier ministre de l'Ontario

October 14 – 18, 2018

A MESSAGE FROM PREMIER DOUG FORD

I'm delighted to extend greetings to the Bengali Hindu community as you celebrate Durga Puja.

During this spectacular festival, also known as the Autumn Festival, you honour the Goddess Durga. This is an important occasion to pay tribute to Durga's victory of good over evil. This is also a chance to connect with family and friends, and help people in the community.

Ontario is proud to be home to a vibrant Bengali Hindu community whose faith reflects the ideals of service, pursuit of wisdom and respect for all religions.

I'd like to take this opportunity to thank members of Bangladesh-Canada Hindu Cultural Society and Bangladesh-Canada Hindu Mandir for their commitment to promoting Bengali Hindu heritage and culture.

Have a blessed and joyous Durga Puja.

Doug Ford
Premier

Message from the Mayor

It is my pleasure to extend greetings and a warm welcome to everyone attending today's festival, Durga Puja, hosted by Bangladesh-Canada Hindu Cultural Society and Bangladesh-Canada Hindu Mandir.

Durga Puja celebrates the Goddess Durga and brings devotees, family and friends together in recognition of this very significant occasion. It is an event that celebrates the rich social and cultural heritage that makes the Bengali-Hindu community so vibrant.

The Bengali community, is one of the fastest growing in our city, and makes an important contribution to the city's diversity.

As one of the world’s most multicultural cities, Toronto is a model city where all religions, faiths and beliefs are respected and accepted.

On behalf of Toronto City Council, please accept my best wishes for a memorable celebration and continued success.

Yours truly,

John Tory
Mayor of Toronto

OFFICE OF THE MAYOR
100 QUEEN STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H 2N2

Nathaniel Erskine-Smith, M.P.

Beaches-East York

Dear Torontonians and visitors,

October, 2018

It is an honour to welcome you to Durga Puja - the Autumn Festival!

This event, hosted by the Bangladesh - Canada Hindu Cultural Society and the Bangladesh - Canada Hindu Mandir, aims to celebrate and promote Bengali Hindu heritage and culture and to bring devotees, families, and friends together to pay homage to Durga. I am pleased to send my congratulations and greetings to mark the occasion.

I admire the work that the Bangladesh - Canada Hindu Cultural Society and the Bangladesh - Canada Hindu Mandir undertake in order to serve our South Asian communities here in Toronto, including hosting valuable cultural events.

This annual Autumn Festival has required a tremendous amount of effort, organizing and hard work. On that note, I would like to thank the organizing team and the volunteers who ensure that such a wonderful event can take place.

Please accept my best wishes on this festive occasion.

Sincerely,

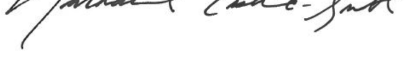

Nathaniel Erskine-Smith

Constituency Office
1902 Danforth Ave
Toronto, ON
M4C 1J4
416 467 0860

House of Commons
802 - Justice Bldg.
Ottawa, ON
K1A 0A6
613 992 2115

Janet DAVIS

City Councillor
Ward 31
Beaches-East York

JAYSON THIESSEN
Executive Assistant

OHANA OLIVEIRA
Constituency Assistant

LAURA NGUYEN
Constituency Assistant

VICTORIA OCCHIPINTI
Constituency Assistant

Toronto City Hall
100 Queen Street West
Suite C57, Toronto ON
M5H 2N2
Tell: 416.392.4035
Fax: 416.397.9289

East York Civic Centre
850 Coxwell Avenue
Toronto, ON
M4C 5R1
Tell: 416.397.4870

councillor_davis@toronto.ca

Twitter @Janet_Davis

www.JanetDavis.ca

September 6th, 2018

Bangladesh-Canada Hindu Cultural Society
& Bangladeshi-Canada Hindu Mandir
16 Dohme Avenue
Toronto, ON
M4B 1Y9

Dear Bangladesh-Canada Hindu Cultural Society
& Bangladeshi-Canada Hindu Mandir:

I would like to extend my best wishes for a wonderful Durga Puja 2018.

Durga Puja is an important festival and a time to spend with family and friends. Thank you for giving Torontonians an opportunity to come together as a community and celebrate Bangladeshi Hindu culture in Canada. Please accept my best wishes for this significant celebration.

I hope to see you at the festival!

Sincerely,

Janet Davis

আস্তিক ও নাস্তিক

জয়দেব রায় চৌধুরী

ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়– বেদের এই মূল্যবান উক্তিটি যাঁরা স্বীকার করেন অর্থাৎ যাঁদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস আছে, তাঁদেরকে আস্তিক এবং যাঁদের ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস নেই তাঁদেরকে নাস্তিক বলা হয়। আবার যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন এবং কোন একটি ধর্মের সাথে জড়িত, তাঁদেরকে ধার্মিক এবং যাঁরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন কিন্তু কোন ধর্মের অনুসারী নন, তাঁদেরকে অধার্মিক বলা যেতে পারে। বর্তমানে পৃথিবীতে লোকসংখ্যা প্রায় ৭৬০ কোটি, তন্মধ্যে ৮৪% ধার্মিক, ৯% অধার্মিক এবং ৭% নাস্তিক।

নাস্তিকের সংখ্যা বেশি এমন প্রথম ছয়টি দেশ হচ্ছে– চীন, জাপান, চেক রিপাবলিক, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া ও আইসল্যান্ড। ভারতে মোট জনসংখ্যার মাত্র ০.২৭% নাস্তিক। গত কয়েক বছর ধরে আমেরিকায় নাস্তিকের সংখ্যা বাড়ছে। ২০14 সালে ছিল ৩% এবং ২০১৬ সালে তা বেড়ে ৪.4% হয়েছে। এই বৃদ্ধি আস্তিকদের কাছে দুর্ভাবনার বিষয়।

> নাস্তিকরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। কারণ ঈশ্বরকে দেখা যায় না। তাছাড়া ঈশ্বর যে আছেন তা প্রমাণ করা যায় না। তাঁরা বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। অনেকের ধারণা, বিজ্ঞানীরা নাস্তিক। ধর্ম বা অলৌকিকে তাঁদের বিশ্বাস নেই।

পৃথিবীর সৃষ্টি এক মহারহস্য। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, সূর্য থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে। আস্তিকরা বিশ্বাস করেন স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন। ভূতত্ত্ববিদদের মতে এই পৃথিবীর বয়স প্রায় ৫০০ কোটি বছর। গোঁড়ার দিকে প্রায় ১৪০ কোটি বছর সময় লেগেছিল কঠিন ভূ-ত্বক গড়ে উঠতে। তারপর থেকে বয়সের পরিমাপ করা হয়েছে শিলার তেজস্ক্রিয়ার বিশ্লেষণ থেকে। পরে প্রাপ্ত ফসিল থেকে জীববিজ্ঞানীরা বিভিন্ন প্রাণীর উৎপত্তির বয়স খুঁজে পান। সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও অ-মেরুদণ্ডী প্রাণী ৬০.৫ কোটি বছর পূর্বে, মাছ ৫০.৫ কোটি বছর, স্থলের উদ্ভিদ ৪৪.৫ কোটি বছর, উভচর প্রাণী ৪১ কোটি বছর, সরীসৃপ ৩৫ কোটি বছর, স্তন্যপায়ী প্রাণী ২৪ কোটি বছর এবং পাখি ২০ কোটি বছর পূর্বে। জীবজগতে মানুষ এসেছে সবচেয়ে পরে, প্রায় ১০ লক্ষ বছর আগে। ১৮59 সালের ২৪ শে নভেম্বর চার্লস রবার্ট ডারউইনের (১৮০৯-১৮৮২) যুগান্তকারী গ্রন্থ "অরিজিন অব স্পিসিস" প্রকাশিত হয়। তিনি বিবর্তন সূত্রের ব্যাখ্যা দিয়ে বললেন যে, মানুষের পূর্বপুরুষ হচ্ছে– "অ্যানথ্রোপয়েড এপ্"। এই এপ্ বলতে বোঝায়– শিম্পাঞ্জি, গোরিলা, ওরাং ওটাং বা গিবন; সাধারণ বানর নয়।

খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল থেকে জানা যায় যে, গড মাত্র ছয় দিনে স্বর্গ, পৃথিবী এবং পৃথিবীর যাবতীয় জড়-জৈব বস্তুর সৃষ্টি করেছেন। তিনি প্রথম দিনে স্বর্গ ও পৃথিবী সৃষ্টি করলেন। সমস্ত পৃথিবী অন্ধকার, তাই তিনি আলো দিয়ে আলো-আঁধারের অর্থাৎ দিন-রাত্রির সৃষ্টি করলেন। দ্বিতীয় দিনে তিনি জল থেকে জল পৃথক করে নদ-নদী, সাগর-সমুদ্র ইত্যাদি এবং স্থলভাগ তৈরি করলেন। তৃতীয় দিনে শাক-সব্জি, গাছপালা, ফল-ফলাদি দিয়ে পৃথিবী ভরে তুললেন। চতুর্থ দিনে সূর্য, চন্দ্র ও তারকা সৃষ্টি করলেন। ফলে দিন, মাস, ঋতু ও বছরের সূত্রপাত হলো। পঞ্চম দিনে সৃষ্টি করলেন জলজ প্রাণী এবং উড়ন্ত পাখি। আর ষষ্ঠ দিনে অর্থাৎ শেষ দিনে সৃষ্টি করলেন গবাদি প্রাণী, বন্য পশু, কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় ইত্যাদি এবং সর্বশেষে মানুষ তৈরি করলেন। সমস্ত কিছু সৃষ্টির পরে সপ্তম দিনে গড বিশ্রাম নিলেন। উল্লেখ্য যে, ষষ্ঠ দিনে গড যে মানুষকে তৈরি করলেন তিনি হলেন অ্যাডাম। মাত্র ৬০০০ বছর পূর্বে তাঁকে স্বর্গের ইডেন গার্ডেন থেকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়। অর্থাৎ মাত্র ৬০০০ বছর পূর্বে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে– যা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়।

সনাতন ধর্মীয় মতে, কোটি কোটি বছর পূর্বে মানুষের আগমন হয়েছে। মহাবিশ্বের সত্যলোক গ্রহে ঈশ্বর প্রথমে ব্রহ্মাকে সৃষ্টি করেন। ভাগবতে উল্লেখ আছে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত সৃষ্টির জন্য ঈশ্বর ব্রহ্মাকে দায়িত্ব প্রদান করেন। ব্রহ্মার শরীর থেকে ৮৪ লক্ষ প্রাণী বা জীবের সৃষ্টি হতে পারে, সেজন্য কোন যৌন ক্রিয়ার প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে এ পর্যন্ত ৮৭ লক্ষ জীবের সন্ধান পাওয়া গেছে, তন্মধ্যে ১২ লক্ষ প্রাণী। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার 'অক্ষর ব্রহ্ম-যোগ' অধ্যায়ে "সৃষ্টি ও প্রলয় তত্ত্বে কাল-গণনা" থেকে জানা যায় যে, মানবগণের ৩৬০ বছরে দেবতাগণের ১ বছর। সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি– এই চার যুগের মোট পরিমাণ (১৭,২৮০০০+১২,৯৬০০০+৮,৬৪০০০+৪,৩২০০০)=৪৩,২০,০০০ বছর। চারযুগে এক মহাযুগ বা চতুর্যুগ। এইরূপ ১০০০ চতুর্যুগে ব্রহ্মার ১ দিন এবং ১০০০ চতুর্যুগে ১ রাত্রি। ১০০ বছর ব্রহ্মার পরমায়ু অর্থাৎ মানুষ পরিমিত ৩ কোটি ১১ লক্ষ ৪ হাজার কোটি বছর। এরপর ব্রহ্মালোকও লোপ পায় এবং ব্রহ্মা পরব্রহ্মে লীন হন।

ব্রহ্মার ১ দিনে ১ কল্প। ১ কল্পে অর্থাৎ ১০০০ চতুর্যুগে ১৪ মন্বন্তর। সুতরাং প্রত্যেক মন্বন্তরে প্রায় ৭১ বার চতুর্যুগ ঘুরে আসে। এইরূপ ১৪ মন্বন্তর শেষ হলে কল্পক্ষয় হয়, তখন প্রলয়। এখন শ্বেত বরাহ কল্পের ৭ম মন্বন্তর চলছে। এই ৭ম মনুর নাম বৈবস্বত মনু। এই মন্বন্তরের ২৭তম মহাযুগ চলে গেছে, এখন ২৮তম মহাযুগের কলিযুগ চলছে। কলির পরিমাণ ৪,৩২,০০০, তন্মধ্যে মাত্র ৫,২০০ বছর পার হয়েছে। তাই কলির শেষ হতে অনেক বাকি, কল্পক্ষয় বা প্রলয় হতে বহু দূর। হিসেব অনুযায়ী প্রায় ২০০ কোটি বছর পূর্বে পৃথিবীতে প্রলয় হয়েছিল।

সম্প্রতি ২০ বছর বয়স্ক বরিস্কা নামক রাশিয়ার এক যুবকের একাধিক বক্তব্যে মহাকাশ বিজ্ঞানীরা বড় দ্বিধায় পড়েছেন। বরিস্কা বলেছেন– পৃথিবীতে জন্ম নেওয়ার আগে তিনি মঙ্গল গ্রহে থাকতেন। মঙ্গল গ্রহের প্রাণীরা সাধারণত সাত ফুট লম্বা হয়। সেখানে এখনও প্রাণের অস্তিত্ব আছে। লাল গ্রহের অভ্যন্তরে তারা বাস করে। কার্বন ডাই-অক্সাইডেই চলে শ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া। পারমাণবিক বিপর্যয়ের কারণেই মঙ্গল গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব নেই। তিনি আরও জানান– প্রযুক্তিগত দিক থেকে মানুষের তুলনায় সেখানের প্রাণীরা অনেক বেশি আধুনিক। তারা এক নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রে ভ্রমণ করতে পারে। প্রাচীন মিশরের সাথে মঙ্গল গ্রহের প্রাণীদের গভীর যোগসূত্র ছিল। সে সময় মঙ্গল গ্রহের যানের চালক হিসেবে বরিস্কা পৃথিবীতে এসেছিলেন। বরিস্কার মা-বাবা জানান– ছোটবেলা থেকেই তিনি মহাকাশ, গ্রহ-উপগ্রহ নিয়ে একাধিক কথা বলতেন। অথচ এগুলোর কোন কিছুই সেই বয়সে তিনি পড়েননি। এমনকি ভিন্ন গ্রহের প্রাণী ও সেখানকার সভ্যতা নিয়েও কথা বলতেন তিনি। মাত্র ২ বছর বয়সেই অনায়াসে লেখাপড়া করতে পারতেন তিনি। তাতে চিকিৎসকরাও অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। ১৯০৮ সাল, ইংল্যান্ডে হাউস অব লর্ডসের জরুরি বৈঠক চলছে। ক্ষমতাসীন দলের একজন বাদে সবাই উপস্থিত। অসুস্থতার কারণে স্যার কর্ন রাশ উপস্থিত থাকবেন না বলে আগেই জানিয়েছিলেন। কিন্তু অধিবেশনের শুরুতেই স্যার রাশকে দেখা গেল তাঁর নির্ধারিত আসনে। অসুস্থতার কোনো চিহ্নই তাঁর চেহারায় ছিল না। অথচ পরে জানা গেল, সেদিন পুরোটা সময়ই তিনি বাসায়ই ছিলেন। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে, একই মানুষ একই সময়ে, দু'জায়গায় হাজির হলেন কিভাবে? প্যারা-সাইকোলজিস্টের দৃষ্টিতে বিষয়টির ব্যাখ্যা হলো, মানুষের আসলে দুটি শরীর আছে। একটি হলো তার পার্থিব শরীর যা সবাই দেখতে পায়। আর অন্যটির অস্তিত্ব আণুবীক্ষণিক বা মানসিক। বিজ্ঞানীরা অবশ্য একে স্বীকৃতি দিতে অক্ষম হলেও, অধিকাংশ বিজ্ঞানীই একমত হয়েছেন– মানুষের মনের ক্ষমতা সাংঘাতিক। এসব বিবেচনায় দ্বিতীয় সত্তার অস্তিত্ব একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

প্রভু শংকরাচার্যের জীবনেও এইরূপ একটি ঘটনা ঘটেছিল। ধ্যানস্থ হয়ে তিনি জানতে পারলেন যে, তাঁর মা অসুস্থ, মৃত্যুপথযাত্রী। তিনি কথা দিয়েছিলেন যে, মৃত্যুর পূর্বে মায়ের সাথে দেখা করবেন। তিনি তখন উত্তর ভারতে, দক্ষিণে তামিল নাড়ু যেতে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে হবে। কিন্তু সময় যে মোটেই নেই। কথিত আছে, যোগবলে তিনি দীর্ঘপথ অতিক্রম করেন এবং দীর্ঘ ২৪ বছর পরে মায়ের সাথে দেখা করেন। জ্ঞাতি গোষ্ঠিরা ছিলেন শংকরাচার্যের জ্ঞান মার্গীয় সাধনার বিরোধী। তাই সর্বসংস্কারমুক্ত এই সন্ন্যাসী একাকী মায়ের দেহের সৎকার করেন।

নাস্তিকরা ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না। কারণ ঈশ্বরকে দেখা যায় না। তাছাড়া ঈশ্বর যে আছেন তা প্রমাণ করা যায় না। তাঁরা বিজ্ঞানে বিশ্বাসী। অনেকের ধারণা, বিজ্ঞানীরা নাস্তিক। ধর্ম বা অলৌকিকে তাঁদের বিশ্বাস নেই। কিন্তু তা ঠিক নয়, অনেক বিজ্ঞানী ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন। আইনস্টাইনের সেই অবিস্মরণীয় উক্তিটির কথা "ধর্ম ছাড়া বিজ্ঞান খঞ্জ, বিজ্ঞান ছাড়া ধর্ম অন্ধ" অনেকেই হয়তো জানেন। লেজার গবেষণার পুরোধা পদার্থবিদ্যায় নোবেল বিজয়ী চার্লস টাউনস মনে করেন, বিজ্ঞান আর ধর্ম শুধু জগৎ-সংসার সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের দুই সমান্তরাল পথই নয়, একে অন্যের পরিপূরকও বটে। সুইডেনের বিজ্ঞানী ক্যারোলাস লিনিয়াস (১৭০৭-১৭৭৮) জীবজগতের শ্রেণিবদ্ধ তালিকা তৈরি করে বিশ্ববিখ্যাত হয়েছিলেন। তাঁর তালিকায় মানুষ ও এপ্-এর স্থান পাশাপাশি। কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের প্রজ্ঞা বা বোধি হচ্ছে অলৌকিক ব্যাপার। চক্ষু সার্জারিতে লেজার কারিগরির উদ্ভাবনী বিজ্ঞানী ড. মনি ভৌমিকের লেখা, "কোড নেম গড" মার্কিন মুলুকে সমালোচনার ঝড় তুলেছিল। তিনি বিজ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে মেলবন্ধন খুঁজেছেন। তাঁর বক্তব্য– বেদই প্রথম সারাবিশ্বকে ঈশ্বর চেতনায় দীক্ষিত করে– যে ঈশ্বর সর্বভূতে বিরাজমান সে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়।

শ্রীরামকৃষ্ণপরমহংসদেব বলেছেন– "জ্ঞান হলো জানা আর বিজ্ঞান হলো বিশেষভাবে জানা", আমি তো কোন পার্থক্য দেখি না। জ্ঞান থাকা ভাল, কিন্তু এই বিশেষভাবে জানতে গিয়ে ধর্মযাজকদের বিচারালয়ে প্রাণ দিতে হয়েছে কয়েকজন সত্যের সন্ধানী বিজ্ঞানীকে। এর জন্য কোন কোন ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের ভুল তথ্য দায়ী। যেমন, গ্রীক দার্শনিকের গুরু অ্যারিস্টটল আর গ্রীক-মিশরীয় গণিতবিদ টলেমী বিশ্বাস করতেন যে, পৃথিবী স্থির এবং অবস্থান করছে সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দুতে। আর পৃথিবীকে কেন্দ্র করে চারিদিকে ক্রমাগত ঘুরছে সূর্যসহ সমস্ত গ্রহ। গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ টলেমী ভূকেন্দ্রিক মডেলের একটি নকশা উপস্থাপন করেন। তাঁর এই ভুল মডেলটি ১৩ শত বছর ধরে সঠিক মতবাদ হিসেবে গৃহীত হয়। কিন্তু জ্যোতির্বিজ্ঞানী জিওদার্নো ব্রুনো এই মতবাদের বিরোধিতা করলেন এবং কোপার্নিকাসের সূর্যকেন্দ্রিক মতবাদকে সমর্থন করায় ধর্মীয় বিচারে তাঁকে জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়। আবার লুচিলিও ভানিনি নামে একজন বিজ্ঞানীকে ধর্মগুরু পোপের বিচারালয়ের রায়ে আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। কেননা তিনি বলেছিলেন যে, 'মানুষের জন্ম অলৌকিক কোন ব্যাপার নয়, সম্পূর্ণ স্বাভাবিক একটি প্রাকৃতিক ঘটনা'। বর্তমানে পরিস্থিতির অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। পোপ ফ্রান্সিস বলেছেন, বিবেকবান নাস্তিকরাই স্বর্গে যাবে।

স্বর্গ ও নরক দুটি ধর্মীয় শব্দ। স্বর্গ ও নরক প্রকৃতপক্ষে আছে কিনা সেটা বিবেচ্য বিষয়। ইহুদী, খ্রিষ্টান এবং ইসলাম ধর্মে স্বর্গ ও নরকের কথা রয়েছে। বিশেষ করে ইসলাম ধর্মে স্বর্গ ও নরকের মোটামুটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র তুলে ধরা হয়। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে তার উল্লেখ নাই, সু-কর্মের ফলে পরম মুক্তি এবং পুনর্জন্মচক্রের বাইরে বেরিয়ে এসে নির্বাণ লাভের কথা বলা হয়েছে। সনাতন ধর্মে স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতালের কথা বলা হয়। স্বর্গ বলতে হিমালয়ের পাদদেশ বুঝায় যেখানে দেবতারা থাকতেন, মর্ত্য হলো ভারতবর্ষ বা অন্যান্য দেশ যেখানে মানুষ বাস করে আর পাতাল হলো মাটির নীচে। জীবের মাঝে আত্মা আছে, মৃতের মাঝে নেই। আত্মা তিন প্রকার–

পরমাত্মা, জীবাত্মা, প্রেতাত্মা। শুভ কর্মের দ্বারা পুনর্জন্ম লাভ না করে পরমাত্মায় বিলীন হওয়াই প্রতিটি জীবের লক্ষ্য। আর এই পরমাত্মা লাভ করাই হচ্ছে স্বর্গপ্রাপ্তি এবং পুনরায় জন্ম নিয়ে মর্ত্যে বাস করা হচ্ছে নরক ভোগ। এরকম বিভিন্ন ধর্মের ভিন্ন উক্তি নাস্তিকতা বৃদ্ধিতে সহায়ক।

আত্মার কথা লিখতে গিয়ে মনে পড়লো টনির কথা। টনি একজন ক্যাথলিক খ্রিষ্টান। আমরা একই কোম্পানিতে কাজ করি। তার বয়স যখন ৭ বছর সে তখন পর্তুগালে থাকত। একদিন রাত্রে প্রায় ২টার সময় সে ঘুম থেকে চিৎকার করে উঠে বসলো– "দু'জন লোক আংকল (তার বাবার বড়দা)-কে ছুরি মারছে, ওরা ওকে মেরে ফেলবে, ওকে তোমরা বাঁচাও।" তার বাবা-মা তাকে বোঝানোর চেষ্টা করছে– তুই দুঃস্বপ্ন দেখেছিস, তোর আংকল ভাল আছে। কিন্তু টনির বার বার একই কথা, তার কান্না থামানো যাচ্ছে না। রাত্রে ৫টার দিকে পুলিশ এসে টনির বাবাকে জানাল যে, তার দাদা খুন হয়েছে। তারা পুলিশের সাথে গেল এবং দু'জনকে আসামি করে পুলিশে রিপোর্ট করলো। এখন এই ৬০ বছর বয়সে টনি তার আংকলের কথা মনে করে। তার আংকল তাকে খুব ভালোবাসতেন। টনির দৃঢ় বিশ্বাস, তার আত্মা এবং তার আংকলের আত্মার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। সে খ্রিষ্টান হলেও, হিন্দুদের মতো পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। এখানে প্রধান প্রশ্ন– টনি কিভাবে জানলো? আস্তিকদের মতে নাস্তিকদের কাজ হলো– ধার্মিকদের কটাক্ষ করা, ধর্মগ্রন্থের বিরূপ সমালোচনা করা; নাস্তিকদের নির্দিষ্ট কোন নীতি ও আদর্শ নেই। আর নাস্তিকদের বক্তব্য– আস্তিকরা অহেতুক সময় নষ্ট করে এবং অর্থ অপচয় করে অদৃশ্য-অস্তিত্বহীন কোন কিছুর উপাসনা করে। প্রকৃতপক্ষে, কিছু কিছু ধর্মগ্রন্থে অবাস্তব, অসঙ্গতিপূর্ণ ও বিভ্রান্তিকর তথ্য বিভিন্ন ধর্মীয় সমাজে পারস্পরিক বিবাদ-মারামারি-হত্যা, ভণ্ড ধার্মিক ও ধর্ম ব্যবসায়ীদের তৎপরতা প্রভৃতি কারণে মানব মনে নাস্তিকতার প্রভাব পড়েছে বা পড়ছে। নাস্তিকদের কারণে ভণ্ড ধার্মিক ও ধর্ম ব্যবসায়ীরা ধর্মের দোহাই দিয়ে সমাজে অরাজকতা সৃষ্টি করতে বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু নাস্তিকদের গে-বিবাহ (পুরুষে পুরুষে বিবাহ) বা লেসবিয়ান বিবাহ (নারীতে নারীতে বিবাহ) আস্তিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ বংশবৃদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সৃষ্টি রক্ষা করা এসব বিবাহে সম্ভব নয়।

আমি দু'জন নাস্তিকের দৃষ্টান্ত তুলে ধরছি। একজন সিনিয়র বন্ধু হিন্দু সংগঠনের সভাপতি। একবার স্থানীয় বনভোজনে ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য কিছু হটডগ কিনলেন। বারবিকিউ করার আগে ধরা পড়লো এগুলো গোমাংসের। সেগুলো ফেলে দেওয়া হল, সংগঠনের অর্থ অপচয় হলো; তবে সবচেয়ে খারাপ লাগলো হটডগ খাবার অপেক্ষায় উপস্থিত ছেলেমেয়েগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে। তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, "এগুলো কিনেছেন কেন?" উত্তরে বললেন, "দেখ, আমি তো নাস্তিক, আমি তো সবই খাই; তাই অতসব ভেবে দেখিনি"। উল্লেখ্য যে উনি নাস্তিক, তাই অন্যদের সুবিধা-অসুবিধা তাঁর কাছে বিবেচ্য নয়। আরেকজন নাস্তিককে বিনয়ের সাথে জিজ্ঞেস করলাম, "আপনি তো নাস্তিক, তবে মন্দিরে আসেন কেন?" তাঁর উত্তর– "বন্ধুদের সাথে দেখা করতে আসি।" সুতরাং দেখা যাচ্ছে, আস্তিকরা যে পূজা-পার্বণ ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানের আয়োজন করে থাকে তা সামাজিকতা ও বন্ধুত্ব রক্ষার্থে অতীব প্রয়োজন।

বিজ্ঞান অনেক কিছু দিয়েছে আমাদেরকে সুস্থ, সুন্দর, আরাম-আয়েশপূর্ণ জীবনযাপনের জন্য। বিজ্ঞানীরা অনেক সত্য উদ্ঘাটন করেছেন বটে, কিন্তু অনেক প্রশ্নের উত্তর দিতে অপারগ। আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় চোখ, কান, নাক, জিহ্বা ও ত্বক দ্বারা যথাক্রমে দেখি, শুনি, গন্ধ পাই, স্বাদ পাই এবং ঠাণ্ডা গরম অনুভব করি। কিন্তু ভালোবাসা, বিশ্বাস, আশীর্বাদ, অভিশাপ এগুলো তো অনুভব করা যায় না, দেখা যায় না। তবে কি সেগুলো নেই, সেগুলো মিথ্যা? সূর্য থেকে পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে, সূর্য কোথা থেকে সৃষ্টি?

মানুষের প্রয়োজনেই মানুষ ধর্ম সৃষ্টি করেছে। ধর্মীয় নীতি, আইন-কানুন মেনে চলে জীবনকে সঠিকপথে রেখে সুন্দর জীবনযাপন করাই হচ্ছে– ধর্ম সৃষ্টির মূল লক্ষ্য। এই ধর্ম পথে থেকেই মহাপুরুষগণ অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়েছেন। ড. ওপেনহেইমার ভগবদ্‌গীতা অধ্যয়ন করে অ্যাটম বোমা তৈরি করেন।

যুক্তরাষ্ট্রের সামাজিক, মানসিক ও ব্যক্তিত্ব বিজ্ঞান বিষয়ক একটি বৈজ্ঞানিক গবেষণাপত্রে বিজ্ঞানীরা তথ্য দিয়েছেন যে, যাদের সাথে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই, তাঁদের তুলনায় ধার্মিক ব্যক্তিরা গড়ে চার বছর বেশি বাঁচেন। কাজেই, আয়ু বৃদ্ধির জন্য ধর্ম পালন করা আবশ্যক।

ভুল করার দুঃখ, কাঙ্ক্ষিত কোন বস্তু না পাওয়ার মানসিক উৎকণ্ঠা বা প্রিয় কোন কিছু হারানোর ফলে মনোবেদনা একজন আস্তিকের চেয়ে একজন নাস্তিকের অনেক বেশি। ঈশ্বরের কাছে সবকিছু সমর্পণ করে একজন আস্তিক মানসিকভাবে শান্তি খুঁজে পায়, কিন্তু নাস্তিকরা তা পান না। কাজেই ঈশ্বর আছেন কিংবা নাই তা চিন্তা না করে তাঁর উপর বিশ্বাস রাখাই শ্রেয়। ❑

বিজয়া: বিরহ বেদনার নয়, আনন্দ ও গৌরবের

চিদানন্দ গোস্বামী

একটি অতি উল্লেখযোগ্য অন্তরস্পর্শী উৎসব বিজয়া। আমাদের জাতীয় উৎসব দুর্গাপূজার ডিউপার্টও বলা যায়। তামাম দেশের লক্ষকোটি মানুষের হৃদয়মন মন্থন করা দুর্গোৎসবের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রেখে বিজয়া মানুষের মন কেড়ে নিয়েছে। কিন্তু দুর্গাপূজার একান্ত ও অবিচ্ছেদ্য হলেও বিজয়াকে ঘিরে দুই মানসিকতার মধ্যে কেমন যেন একটা ফারাক দেখা যায়। আনন্দে আবেগে উল্লাসে আর উদ্দীপনায় দুর্গাপূজা জনগণমন মন্থন করে পরম পরিতৃপ্তি ও আনন্দের মাখনটি তুলে নেয়। অন্যদিকে দশমীতিথির বিজয়া যেন একরকম বিরহ বেদনায় ও অবসাদের মূর্ছনায় মনপ্রাণ আচ্ছন্ন করে দেয়। কেন? কেনই বা এই সুর বৈপরীত্য? ট্র্যাডিশন? কিন্তু ট্র্যাডিশনের মূলে তো একটা মানসিকতা কাজ করে নিশ্চয়। এ প্রসঙ্গে কোনও জিজ্ঞাসাকে বোধ হয় একেবারে উৎখাত করাও যায় না। একদিকে আনন্দ আর গৌরবময় আদর্শ এবং অন্যদিকে বিরহ বেদনা। জিজ্ঞাসা জাগে, দুর্গাপূজার সন্নিহিত বিজয়া পর্বটি কোন শিবিরে। সামাজিক সম্ভাষণে আমরা বলি 'শুভ বিজয়া'। তো কেন এই শুভ বিজয়ায় বিরহ বেদনায় ছায়াপাত? জিজ্ঞাসা জন্মায়। এ কি তিনদিনের চনমনে উদ্যম আবেগের পর স্বাভাবিক ক্লান্তি বা অবসাদ? নাকি বিজয়ার তত্ত্বগত চরিত্রটাই এক ভিন্ন মাত্রায় রচনা করা হয়েছে, প্রশ্ন হয়।

বাংলার পারিবারিক স্নেহমায়া মমতার চিরন্তন অনন্ত ধারা সন্তান স্বরূপ লক্ষ মানুষের হৃদয়মন আপ্লুত করে রেখেছে। 'নবমীর নিশিরে তোর দয়া নাই' এবং 'যেওনা রজনী আজি লয়ে তারাদলে/ গেলে তুমি দয়াময়ী এ পরাণ যাবে' বলে মাতা মেনকার আর্তি ও হাহাকার।

প্রসঙ্গত চলে আসা যাক রাবণবধ বিষয়ে। রামায়ণের এবং আধ্যাত্মিক ইতিহাসের একটি বড়সড় ঘটনা তো রাবণবধ এবং রাবণবধের জন্যে অবতার শ্রীরাম দুর্গাপূজা করেছিলেন। পূজায় সিদ্ধিলাভ করে রামচন্দ্র বধ করলেন রাবণকে। সেই অকালবোধন থেকেই দুর্গাপূজার পত্তন। একটা প্রশ্ন এসে যায় রাবণবধের হেতু নিয়ে। স্বাভাবিক কোনও দুর্জন দুর্বৃত্ত এবং গণহত্যার ঘাতক বলেই কি? না, রাবণের দুর্বৃত্ত-স্বরূপের গভীরে একটা ভয়াবহ ও ক্ষমার অযোগ্য পরিচিতি আছে। সেটা আধ্যাত্মিক তত্ত্বে অতি উল্লেখযোগ্য। সেটা হল সীতা হরণ। এটা মামুলি কোনও নারী হরণই নয়। সীতা শুধু কোনও এক নারীরূপেই চিহ্নিত নয়। পবিত্র প্রেম ভক্তির পরমোজ্জ্বল প্রতীক সীতা। এই পরিচয়ের মধ্যে নিহিত আদর্শটি শ্রীরামচন্দ্রের ঘরনি পরিচয়ের চেয়ে অনেক অনেক বেশি স্মরণীয় ও গৌরবোজ্জ্বল। এই প্রেমভক্তি লুণ্ঠনের ঘোর অপরাধে দাগি অপরাধী রাবণ। রাবণ ভারতবর্ষের তথা বিশ্বের প্রেমভক্তি লুঠ করে ক্ষমাহীন অপরাধে অভিযুক্ত। আশ্বিনের শুক্লপক্ষের সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী তিথিতে শ্রীরাম সাগর পেরিয়ে শ্রীলঙ্কায় গিয়ে মহাযুদ্ধে রাবণ বধ করলেন। অষ্টমী ও নবমীর সন্ধিক্ষণে রাবণবধ হল। দুর্জন দমন করে সীতা উদ্ধার করে শ্রীরামচন্দ্র অযোধ্যায় ফিরছেন লক্ষ লক্ষ মানুষকে নিয়ে দশমী তিথিতে। এই দশমী–বিজয়াদশমী নামে চিহ্নিত। এই তো বিজয়া। অর্থাৎ বিশেষ রূপ জয়ই বিজয়া। অতএব পরম আনন্দের, আদর্শের বিশেষ জয়ের, আবেগের এবং বিশ্বজগতের প্রেমভক্তি উদ্ধারের মহাগৌরবের এক অক্ষয় ইতিহাস এই বিজয়ার দিন। তবে কেন আনন্দময়, গৌরবময় এই বিজয়া তিথিতে কারুণ্য বিরহ ও বেদনার ছায়াপাত! তবে কি এমন ছায়াপাতের কারণ হিসেবে একটি উপঘটনা কাজ করছে?

দেবী দুর্গা তো আমাদের জননী। 'যা দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা'। কৈলাসের পতিগৃহ থেকে মর্তভূমিতে পিত্রালয়ে এসেছেন জননী দুর্গা। সপ্তমী থেকে নবমী–এই তিনদিন কন্যা দুর্গা মা মেনকার স্নেহে আদরে দিন কাটালেন। দশমীতে দুর্গার পতিসঙ্গে কৈলাসে প্রত্যাবর্তন। এখানেই একটি গার্হস্থ্য দুঃখ।

বাংলার পারিবারিক স্নেহমায়া মমতার চিরন্তন অনন্ত ধারা সন্তান স্বরূপ লক্ষ মানুষের হৃদয়মন আপ্লুত করে রেখেছে। 'নবমীর নিশিরে তোর দয়া নাই' এবং 'যেওনা রজনী আজি লয়ে তারাদলে/ গেলে তুমি দয়াময়ী এ পরাণ যাবে' বলে মাতা মেনকার আর্তি ও হাহাকার। বিজয়া দশমীতে বিদায় বেদনা ছড়িয়ে পড়ে বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিটি পরিবারে। এই বেদনা বিরহ যেন বিজয়া দশমীর তত্ত্বের মৌলিক আনন্দ ও গৌরবকে গ্রাস করতে চাইছে। প্রেম ভক্তি পুনরুদ্ধারের আনন্দ ও গৌরবের মুখোমুখি যেন বিদায় বেদনার লৌকিক বিষয়টি। একদিকে শাশ্বত জননী মেনকার দীর্ঘশ্বাস ও বিরহ। অন্যদিকে বিজয়ার কোলাকুলি আলিঙ্গন প্রীতি প্রণাম সম্প্রীতি আর মিলন বিজয়া তিথিতে দেদীপ্যমান।

সব শেষে একটি 'কিন্তু' অব্যয় এসে যায়। ইদানীং কালে ভাবলে বিস্ময় জাগে। কোথায় আমাদের আলিঙ্গন, ভালোবাসার চর্চা, প্রণাম, নমস্কার, শুভকামনা। অথচ এগুলো মানব সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল বহুমূল্য সম্পদ। শুধু সার সর্বস্ব হয়ে উঠেছে মিষ্টি মুখের কালচার। যার মধ্যে লৌকিকতা, আনুষ্ঠানিকতা এবং আচারের শুষ্কতা মাত্র। কিন্তু বিজয়াতে কামনা করি প্রেমপ্রীতি সম্প্রীতি ও মানবিকতা। বিজয়া তিথির চিরস্মরণীয় আদর্শের আধ্যাত্মিক মহা সম্পদের তত্ত্ব এবং গার্হস্থ্য লৌকিক তত্ত্বের পরম্পরা। এই দুয়ের সমন্বয়ে প্রার্থনীয় একটি কথা। মা, সর্বভূতে তুমি সংস্থিতা হও ভক্তি, প্রেম, মানবতা, সম্প্রীতি, শক্তি এবং প্রজ্ঞারূপে। আনন্দময়ী আর কল্যাণীরূপে। ❑

ঋগ্বেদের মাহাত্ম্য

ড. দিলীপ চক্রবর্তী

(গতবারের চিন্ময়ীতে প্রকাশিত আমার নিবন্ধের পরের ভাগ)

বেদ পৃথিবীর প্রাচীনতম এবং বৃহত্তম ধর্মগ্রন্থ। ঋক, সাম, যজু এবং অথর্ব –বেদের এই চারভাগের মধ্যে আয়তন এবং মর্যাদায় ঋগ্বেদ প্রধানতম।

আমরা বিশ্বে হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিসেবে পরিচিত কিন্তু আসলে হিন্দুধর্ম নামে কোন ধর্মই নেই। বিদেশীদের উচ্চারণের ভুলে আমরা হিন্দু হিসেবে পরিচিত। আসলে আমাদের ধর্ম বৈদিক ধর্ম, কারণ আমাদের ধর্ম বেদের উপর আশ্রিত। বহিরাগতরা মূলত ভারতের উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়েই ভারতে প্রবেশ করেছে। প্রথমেই তারা সিন্ধু নদের সাক্ষাৎ পায়, কিন্তু ওই বিদেশীরা 'স' কে 'হ' উচ্চারণ করতো, ফলে সিন্ধুনদ ওদের উচ্চারণে *হিন্দু নদ* হয়ে যায় এবং সিন্ধু নদের তীরবর্তী জনগণ হিন্দু নামে পরিচিত হয়।

বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ বড় ধর্ম কোনো এক বা একাধিক প্রবক্তার নামানুসারে হয়েছে– যেমন, যিশু খ্রিষ্টের অনুসারীরা খ্রিষ্টান, মহামতি বুদ্ধের অনুগামীরা বৌদ্ধ কিন্তু হিন্দুধর্ম সইভাবে প্রবক্তার নামানুসারে নয়।

বেদ প্রথমে ছিলো অখণ্ড, মহাভারতের রচয়িতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস (গায়ের রং কালো বলে "কৃষ্ণ", দ্বীপে জন্ম বলে "দ্বৈপায়ন", বেদের বিভাগ বা ব্যাস করেছিলেন বলে "বেদব্যাস") অখণ্ড বেদকে চারভাগে ভাগ করেছিলেন– ঋক, সাম, যজু এবং অথর্ব।

বেদ এত মূল্যবান এবং প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ যে, আমাদের কৌতূহল হওয়া খুব স্বাভাবিক যে বেদের মূল বিষয়বস্তু এতে যে মন্ত্র বা প্রার্থনা আছে তা মূলত কাকে উদ্দেশ্য করে? যেহেতু বেদের বেশির ভাগ মন্ত্র ঋক্‌বেদে পাওয়া যায়।

সমগ্র বেদ প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ এবং বেদের চার ভাগের মধ্যে ঋকবেদ প্রাচীনতম। ঋকবেদ প্রধানত সকাম প্রার্থনা। মন্ত্রগুলি ছন্দোবদ্ধ।

বৈদিক যুগে লিখে রাখার প্রথা ছিলো না, বেদের মন্ত্রগুলি মুনি ঋষিদের শিষ্যরা মুখস্থ রাখতো, তার ফলে সময়ের সঙ্গে বেদের অনেক মন্ত্র হারিয়ে যায়। বর্তমান কালে বেদের মোট উপলব্ধ মন্ত্র সংখ্যা কুড়ি হাজারের সামান্য বেশি। এতেই বোঝা যায় যে বেদের বর্তমানে প্রাপ্ত ২০,৩৭৯ মন্ত্রের মধ্যে ঋকবেদের মন্ত্রসংখ্যা ১০,৫৫২ অর্থাৎ বেদের মোট মন্ত্র সংখ্যার অর্ধেকেরও বেশি। শুধু তাই না বাকি তিন বেদের অনেক মন্ত্র ঋকবেদ থেকে নেওয়া। যেমন প্রথমেই সামবেদে ঋকবেদের প্রায় সব মন্ত্রই নেওয়া আছে– সামবেদের ১,৮৭৫ মন্ত্রের মধ্যে ১৮০০টি মন্ত্র নেওয়া হয়েছে ঋকবেদ থেকে। সেইরকম যজুর্বেদেরও প্রায় সব মন্ত্রই (১৯৭৫ এর মধ্যে ১৯০০টি) ঋকবেদ থেকে নেওয়া। একমাত্র অথর্ব বেদে (যেটা বেদের সবচেয়ে নবীন এবং নিকৃষ্টতম) ঋকবেদের মোট মন্ত্রের মাত্র এক পঞ্চমাংশ নেওয়া হয়েছে (৫,৯৭৭ মধ্যে ১২০০টি)। শুধু এটাই না, বেদের যে একটি মূল মন্ত্র (যেটাকে গায়ত্রী মন্ত্র বলা হয়) হল– "তৎ সবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ"– তার প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ সামবেদ এবং যজুর্বেদে দেখা যায়, এরকম উদাহরণ আরো আছে।

বেদ এত মূল্যবান এবং প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ যে, আমাদের কৌতূহল হওয়া খুব স্বাভাবিক যে বেদের মূল বিষয়বস্তু এতে যে মন্ত্র বা প্রার্থনা আছে তা মূলত কাকে উদ্দেশ্য করে? যেহেতু বেদের বেশির ভাগ মন্ত্র ঋক্‌বেদে পাওয়া যায় তাই আমরা ঋকবেদের সম্বন্ধে মোটামুটি ধারণা করতে পারলে পুরো বেদ সম্বন্ধেই একটি ধারণা হয়ে যাবে। আমরা জানি যে ঋক্ মানে মন্ত্র, এই মন্ত্রের সমষ্টি বলেই এই বেদকে ঋগ্বেদ বলা হয়। ঋগ্বেদের শুধু প্রথম এবং দশম মণ্ডলে বিভিন্ন ঋষিদের ঋক বা মন্ত্র সন্নিবেশিত যদিও বাকি সমস্ত মণ্ডলে এক একজন ঋষি, তাঁর শিষ্য বা বংশধরদের মন্ত্র সন্নিবেশিত, কয়েকটি ঋক্ কয়েকজন ঋষি দ্বারা সমবেতভাবে লিখিত এবং সেগুলো এক বা একাধিক দেবতার উদ্দেশ্যে নিবেদিত। এগুলোকে সূক্ত বলে।

সাধারণ লোকদের ধারণা যে ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলো দেবতাদের উদ্দেশ্যে সকাম প্রার্থনা– অন্ন, বৃষ্টি, অশ্ব, দীর্ঘায়ু, ধন, পুণ্য, পাপ-বিমোচন, শত্রু বিনাশ এমনকি সুন্দরী স্ত্রী লাভের জন্য প্রার্থনা। কিন্তু অনেক পণ্ডিতের মতে বেদের একটা অন্তর্নিহিত অর্থ আছে– সেটা সকাম প্রার্থনা নয়; পরমাত্মার স্বরূপ অন্বেষণ ও অনুধাবন। ঋগ্বেদের একটি মূল বক্তব্য এই যে জীবাত্মার ধ্বংস নেই– সে নানা যোনিতে বিরাজ করে। উৎকৃষ্ট যোনিতে অবস্থান কালে অনেক গুণবান হন, কিন্তু নিকৃষ্ট যোনিতে অবস্থানকালে অল্প গুণবান হন। অনুরূপ অভিব্যক্তি আমরা শ্রীমদ্ভগবত গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের দ্বাবিংশতম শ্লোকে পাই যেখানে বলা হয়েছে– যেমন মনুষ্য জীর্ণ বস্ত্র পরিত্যাগ করে নতুন বস্ত্র ধারণ করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণ-শরীর পরিত্যাগ করে নতুন শরীর গ্রহণ করে।

আমরা এটা জেনে যুগপৎ বিস্মিত এবং আনন্দিত হই যে ওই সময়ে সমাজে নারীর খুব মর্যাদা ছিলো। ঋগ্বেদের বেশ কয়েকটি সূক্তের রচয়িতা কোন নারী ঋষি। এটা আমরা সহজেই অনুমান করতে পারি যে সেই প্রাচীন যুগে নারীরাও পুরুষদের মতন সমান শিক্ষার সুযোগ পেয়েছেন এবং তার ফলেই নারীরাও এমন সুন্দর সুন্দর ঋক্ রচনা করেছেন। অনেক নারী ঋষিদের মধ্যে ঋষি অগস্ত্যের স্ত্রী লোপামুদ্রা, কক্ষিবৎ ঋষির কন্যা ঘোষা, অত্রি ঋষির কন্যা অপালা, ঋষি অসঙ্গের স্ত্রী শাশ্বতী প্রমুখ। এছাড়াও উল্লেখযোগ্য নারী ঋষিদের মধ্যে ইন্দ্রাণী, শ্রদ্ধা, সার্পরাজ্ঞী উল্লেখযোগ্য।

(পরবর্তী অংশ ৪২ পৃষ্ঠায় দেখুন)

মহাঋষি বিশ্বামিত্র ও গায়ত্রী মন্ত্র এবং জপ

দেব কুমার শর্মা

ওঁ নমঃ বিশ্বদেবায়

বিশ্বামিত্র ঋষির নাম কমবেশি আমাদের সকলেরই পরিচিত। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল বিশ্বরথ এবং তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয় কুলজাত। তাঁর আদি পুরুষ পৌরাণিক রাজা কুষব্রক্ষা, যিনি পিতামহ ব্রহ্মার সরাসরি বংশজাত।

পিতামহ ব্রহ্মা তাঁর এক মানসপুত্র কুষব্রক্ষাকে পৃথিবীতে রাজত্ব করতে পাঠান। এই কুষব্রক্ষার চার পুত্র ছিল, যাদের নাম যথাক্রমে– কুষাসম্ব্য, কুষানাথ, অদৈত রজত ও বসু। কুষানাথের একশত পুত্র ছিল, যারা সকলেই ব্রহ্মচর্য্য পালন করলেন। তারপর কুষানাথ আবার পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ করলেন। তখন গাঁধী নামে তাঁর এক পুত্র হলো। পরবর্তীকালে গাঁধীর এক কন্যা জন্ম নিল, তার নাম ছিল সত্যবতী। এরপর গাঁধী পুত্রলাভের জন্য যজ্ঞ করলেন, আর এই যজ্ঞের ফলস্বরূপ এক পুত্রের জন্ম হলো, তার নাম দেওয়া হলো বিশ্বরথ। রাজা হিসেবে গাঁধীপুত্র বিশ্বরথ ছিলেন বীর যোদ্ধা, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং নির্মম। সেই সাথে তাঁর ছিল প্রচণ্ড অহংকার, ক্রোধ এবং মনের দৃঢ়তা। সিংহাসনে আরোহণের পরই তিনি তার রাজ্যের আশেপাশের সমস্ত রাজ্য দখল করে নেবার জন্য বিজয় অভিযানে বের হলেন এবং রক্তের নদী বইয়ে সকল রাজ্য দখল করে নিলেন। রাজধানীতে ফেরার পথে তিনি মহাঋষি বশিষ্ঠের আশ্রমে উপনীত হলেন। মহাঋষি বশিষ্ঠ তাকে এবং তার সমুদয় সৈন্যবাহিনীকে এক বেলা ভোজনের আমন্ত্রণ করলেন। ভোজন সমাপ্ত হলে রাজা বশিষ্ঠমুনির কাছে জানতে চাইলেন কিভাবে তিনি এত সুস্বাদু ভোজ এত লোকের জন্য আয়োজন করলেন। মুনি বশিষ্ঠ জানালেন, এই আশ্রমে ভগবানের আশীর্বাদপ্রাপ্ত নন্দীনি নামে একটি গাভী আছে। সেই গাভীমাতাকে পূজা করে সন্তুষ্ট করতে পারলে মাতার আশীর্বাদেই এসব সম্ভব হয়। রাজা সেই বিশেষ গোমাতাকে দেখতে চাইলেন। রাজা তার রাজধানীতে ফিরে গেলেন ঠিকই, কিন্তু এই বিশেষ গোমাতাটি পাবার লোভ কিছুতেই সামলাতে পারলেন না। ক'দিন পরেই তিনি মহামন্ত্রীকে ঋষি আশ্রমে পাঠালেন সেই গোমাতাকে নিয়ে আসার জন্যে। মুনি কিন্তু সঙ্গতকারণে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। অহংকারী রাজা বিশ্বরথ তখন তার সেনাদলসহ প্রধান সেনাপতিকে পাঠালেন, বলপূর্বক গোমাতাকে অপহরণ করার জন্য। সেনাপতিও ব্যর্থ হবার পর ক্রোধিত বিশ্বরথ বিশাল সৈন্যদল নিয়ে নিজেই গেলেন মুনির আশ্রমে। কিন্তু মহাঋষি বশিষ্ঠের যোগবলের কাছে রাজা বিশ্বরথ পুরোপুরি পরাজিত হলেন। বশিষ্ঠদেব রাজাকে বললেন, একমাত্র মহাঋষি হবার পরই রাজা এই গোমাকে লাভ করতে পারবেন, তার আগে নয়।

দৃঢ় মানসিক শক্তির অধিকারী হয়ে নিজেই মহাঋষিত্ব অর্জন করবেন এবং তারপরই বশিষ্ঠ মুনির সাথে দেখা করবেন– বিশ্বরথ এমন প্রতিজ্ঞা করেন। রাজধানীতে ফিরেই তিনি আপন পুত্রকে রাজারূপে সিংহাসনে অভিষিক্ত করলেন এবং একনিষ্ঠ যোগ-সাধনার জন্য নির্জন বনে প্রবেশ করলেন। সেখানে কুটির নির্মাণ করে তিনি গভীর যোগ-সাধনায় রত রইলেন বহু বছরকাল এবং অবশেষে হিংস্র, অহংকারী ক্ষত্রিয় রাজা বিশ্বরথ হয়ে গেলেন মহাঋষি বিশ্বরথ। আপন সাধনবলে তিনি গায়ত্রী মাতাকে প্রকট করলেন এবং গায়ত্রী মন্ত্রের সৃষ্টি করলেন।

আমরা এখানে যে গায়ত্রী মন্ত্রের কথা বলছি তা হলো– ব্রহ্ম-গায়ত্রী। প্রত্যেক দেবতারই প্রার্থনা পর্বে ভিন্ন ভিন্ন গায়ত্রী আছে। যেমন শ্রীবিষ্ণুর গায়ত্রী হচ্ছে–

> "ত্রৈলোক্য-মোহনায় বিদ্মহে, কামদেবায় ধীমহি।
> তন্নো বিষ্ণু প্রচোদয়াৎ।"

শিব গায়ত্রী–

> "তৎপুরুষায় বিদ্মহে, মহাদেবায় ধীমহি।
> তন্নো রুদ্রঃ প্রচোদয়াৎ।" ইত্যাদি

যা শুধু সেই দেবতারই পূজাপর্বে পাঠ করা হয়। অপরদিকে ব্রহ্ম হচ্ছেন নির্গুণ, নিরাকার, জ্যোতির্ময়– যার ব্যাপ্তি পৃথিবী, পাতাল, স্বর্গ, মহাকাশ, চিদাকাশ, সকল গ্রহ-নক্ষত্রসহ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড। তাই এই গায়ত্রী 'জপ' ও 'সাধনের' বলে মানুষ এই মহাসৃষ্টির সকলেরই পূজা করছেন এবং সকলেরই আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন। মহাঋষি বিশ্বামিত্রের কঠোর যোগ-সাধনার প্রভাব স্বর্গলোক, ব্রহ্মালোক, বিষ্ণুলোক, শিবলোক হয়ে ব্রহ্মালোকেও পৌঁছে গেল। ত্রি-দেব ও ত্রি-দেবী সন্তুষ্ট হলেন, মুগ্ধ হলেন এবং সম্মিলিতভাবে আশীর্বাদ করলেন। এই সম্মিলিত আশীর্বাদে যুক্ত হলেন যথাক্রমে– ব্রহ্মা-সরস্বতী, শ্রীবিষ্ণু-মাতা লক্ষ্মী এবং দেবাদিদেব মহাদেব-মাতা পার্বতীর শুভ শক্তি। এই প্রচণ্ড শক্তিশালী মিলিত ত্রি-দেব ও ত্রি-দেবীর শুভ শক্তিতেই আবির্ভূত হলেন "গায়ত্রী মাতা" যা শুধুই কল্যাণকারী, মঙ্গলকারী ও সদাই শুভ ফল প্রদানকারী। পরমপিতা ব্রহ্ম-এর জ্যোতির্ময় শক্তিতেই ত্রি-দেব, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরের সৃষ্টি, তাই এই ত্রি-দেবের শুভ আশীর্বাদের মিলনে যে দেবীর

ব্রহ্ম হচ্ছেন নির্গুণ, নিরাকার, জ্যোতির্ময়– যার ব্যাপ্তি পৃথিবী, পাতাল, স্বর্গ, মহাকাশ, চিদাকাশ, সকল গ্রহ-নক্ষত্রসহ সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড। তাই এই গায়ত্রী 'জপ' ও 'সাধনের' বলে মানুষ এই মহাসৃষ্টির সকলেরই পূজা করছেন এবং সকলেরই আশীর্বাদ লাভের সৌভাগ্য অর্জন করতে পারেন।

আবির্ভাব হলো– তিনিও হলেন ব্রহ্মময়ী মাতা গায়ত্রী, ব্রহ্ম শক্তির প্রতীক, তিনিই বেদ মাতা। তাই তার প্রার্থনা মন্ত্রও ত্রি-ভুবন জুড়ে। যেমন–

"ওঁ ভূঃ ওঁ ভুবঃ ওঁ স্বঃ ওঁ মহঃ ওঁ জনঃ ওঁ তপঃ ওঁ সত্যম্।
ওঁ তৎ সবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি।
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ।
ওঁ আপো জ্যোতিরসোঽমৃতং ব্রহ্মভূর্ভুবঃ স্বরোম্ ॥"

গায়ত্রী মন্ত্র জপের শুরুতে যথারীতি আচমন ও গায়ত্রী আবাহনপূর্বক একবার উপরিউক্ত পূর্ণ গায়ত্রী জপ করে, তারপর স্বাভাবিকভাবে গায়ত্রী জপ করা হয়। যেসব সাধক গায়ত্রী সাধনা করতে চান, তাদের জন্য এই লেখার শেষপর্বে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেবার চেষ্টা করবো। আর যারা গায়ত্রী সাধনা করবেন না, সেই অংশটি তাদের প্রয়োজন নেই।

বিশ্বামিত্র ঋষি সম্পর্কে আরও দু'একটি তথ্য দেবার পর গায়ত্রী সাধনার পদ্ধতি সম্পর্কে বলবো। ঋক্‌বেদের তিনটি মণ্ডলের রচয়িতা হলেন মহাঋষি বিশ্বামিত্র। তিনি সমগ্র বেদের আধ্যাত্মিক অর্থ ও ভাব অবগত হয়েছিলেন। দেবরাজ ইন্দ্রের সাথে রেষারেষি করে তিনি ত্রি-শঙ্কু মহারাজকে স্ব-শরীরে স্বর্গে পাঠিয়েছিলেন তাঁর যোগশক্তি বলে। প্রকৃতির সাধারণ নিয়মমতে– পঞ্চতত্ত্বে নির্মিত এই মানবদেহ পৃথিবীকে ফেরত দিয়েই জীবাত্মা ও পরমাত্মা পরলোকে অর্থাৎ স্বর্গ, নরক, বিষ্ণুলোক বা শিবলোকে যেতে পারে। এই পঞ্চতত্ত্ব হচ্ছে– মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি ও মরুত। এসবই মানুষ জন্মমুহূর্ত থেকে ধরিত্রীমাতার কাছ থেকেই জীবিতকালের জন্য ধার/ঋণ হিসেবে গ্রহণ করে। আর দেহান্তে এসবই পৃথিবীমাতাকে ফিরিয়ে দিয়ে শুধু আপন আপন কর্মফল সাথে নিয়ে পরপারে যাত্রা করে। কিন্তু বিশ্বামিত্র মুনি আপন যোগশক্তি বলে এই নিয়ম ভঙ্গ করে ত্রি-শঙ্কু রাজাকে রক্তমাংসের শরীরসহ ইন্দ্রপুরীতে পাঠিয়েছিলেন। অবশ্য দেবরাজ কিছুক্ষণের মধ্যেই ত্রি-শঙ্কুকে জোর করে পৃথিবীতে ফেরত পাঠিয়েছিলেন। বিশ্বামিত্র মুনি তখন আপন যোগশক্তি বলে ত্রি-শঙ্কুর জন্য নতুন এক স্বর্গ নির্মাণ করেন। একবার বিশ্বামিত্র মুনির ধ্যান ভঙ্গ করার জন্য স্বর্গীয় নর্তকী মেনকাকে প্রেরণ করেন। মেনকা মুনির ধ্যান ভঙ্গ করতে সমর্থ হন এবং বিশ্বামিত্র মুনিকে বিবাহ করেন। সেখানে তাদের একটি কন্যা সন্তান জন্ম নেয়, যার নাম ছিল শকুন্তলা। মেনকা কর্তৃক শকুন্তলা পরিত্যক্ত হলে কণ্ব মুনির আশ্রমে শকুন্তলা পালিত হন। পরবর্তীকালে হস্তিনাপুরের (হস্তিন) রাজা দুষ্মন্তের সাথে শকুন্তলার বিবাহ হয়। এই বিবাহের ফলে তাদের এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয়– যার নাম ছিল 'মহারাজ ভারত'। এই রাজা ভারত বিশাল সাম্রাজ্য নির্মাণ করেন এবং তার নামানুসারেই আজও এই ভূ-ভাগের নাম ভারতবর্ষ। এই ভারত বংশের অনেক বিবরণ আমরা মহাভারতে পাই। রাজা শান্তনু, কুরু, পাণ্ডব এরা সকলেই ভারত বংশের সন্তান। মহাঋষি বিশ্বামিত্রের কাহিনী এখানেই সীমিত রেখে এবার গায়ত্রী সাধন পদ্ধতির কথায় আসি। যারা গায়ত্রী সাধনা করতে চান, এই অংশটুকুই তাদের উপকারে লাগতে পারে।

গায়ত্রী সাধনার সংক্ষিপ্ত পদ্ধতি:

প্রথমেই বলে নেওয়া প্রয়োজন যে, গায়ত্রী সাধনা একটি পরিপূর্ণ সাধন পথ, শুধু সঠিকভাবে নিষ্ঠার সাথে নিয়মিত গায়ত্রী সাধনা করে সাধকের ব্রহ্মদর্শন হতে পারে, তার আর অন্য কোন সাধন পথ অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। এই সাথে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ হচ্ছে– সঠিক ছন্দে, সঠিক পদ্ধতিতে গায়ত্রী সাধনা করা। প্রতিটি বেদমন্ত্রের প্রথমে মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষির নাম, মন্ত্রের দেবতা এবং কোন্ ছন্দে এই মন্ত্রপাঠ করতে হবে তা উল্লেখ থাকে। গায়ত্রী মন্ত্রও একটি অতি শক্তিশালী বৈদিক মন্ত্র; কাজেই অবশ্যই সটিক উচ্চারণে এবং সঠিক ছন্দে এবং উপযুক্ত পরিবেশে তা পাঠ করতে হবে। অন্যথায় ঢোল, করতাল, হারমোনিয়াম বাজিয়ে যেকোন সুরে, যেকোন ছন্দে ও মাত্রায় এই মহামন্ত্র পাঠ করা অর্থহীন এবং পণ্ডশ্রম। যারা নিয়মিত গায়ত্রী পাঠ করেন, এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেবার অনুরোধ রইল। লেখার মাধ্যমে গায়ত্রীর সুরের বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তাই কোন জ্ঞানী পণ্ডিতের ইউটিউব থেকে এটা শিখে নিতে পারেন। আমি এখানে ছন্দের অর্থাৎ একবারে কতটুকু অংশ বলতে হবে, কোথায় থামতে হবে, সাধ্যমত তার বর্ণনা দেবার চেষ্টা করবো। জানি না কতটা সফল হব। এবারে ধারাবাহিকভাবে বিবরণ দিচ্ছি:

কোন কোলাহলপূর্ণ স্থানে গায়ত্রী জপ হয় না, শান্ত পরিবেশ প্রয়োজন। নির্জন ঘরে, বাগানে বা পার্কে, গাছের ছায়ায় বা জলাশয়ের কাছে এই সাধনার উপযুক্ত স্থান।

বিধি মোতাবেক দিনে ত্রি-সন্ধিক্ষণে গায়ত্রী জপ করা উচিত– একবার সকালে সূর্য উদিত হবার পূর্বে, দ্বিতীয়বার দিনের মধ্যভাগে এবং বিকালে সূর্য অস্ত যাবার পর পর। এছাড়াও সারাদিন চলার সময়, হাতে কোন কাজ করার সময় মনে মনে গায়ত্রী জপ করতে পারেন। প্রতিবারেই আপনার সুখাসনে, পরিষ্কার বস্ত্র পরিধান করে, আচমন করবেন, বিষ্ণু স্মরণ করবেন, আসন শুদ্ধি করবেন এবং যারা কোন মন্ত্রে দীক্ষিত তারা গুরু স্মরণ এবং জপ মন্ত্র পাঠ করবেন। প্রতিবারই শুরুতে এই মন্ত্রে গায়ত্রী দেবীকে আবাহন করবেন।

আবাহন মন্ত্র:

"ওঁ আয়াহি বরদে দেবী ত্র্যক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।
গায়ত্রি চ্ছন্দসং মাতর্ব্রহ্মযোনি নমোঽস্তুতে।"

(এখানে "ঽ" এর উচ্চারণ নেই, শুধু 'নমো' কে একটু লম্বা করবেন)

এরপর গায়ত্রী ধ্যান: সকাল, দুপুর ও বিকালের জন্য তিনটি ভিন্ন ভিন্ন ধ্যান মন্ত্র আছে। যে সময়ের যে ধ্যান, আবাহনের পর তা পাঠ করবেন।

সকালে:

ওঁ কুমারীমৃগ্‌ দেবযুতাং ব্রহ্মরূপাং বিচিন্তয়েৎ।
হংসস্থিতাং কুশহস্তাং সূর্যমণ্ডল-সংস্থিতাম্।
(কারণ সকালে গায়ত্রী মাতা ব্রহ্মরূপিণী)

মধ্যাহ্নে:

"ওঁ মধ্যাহ্নে বিষ্ণুরূপাঞ্চ, তার্ক্ষ্যস্থাং পীতকাসসম্।
যুবতীঞ্চ যজুর্ব্বেদাং সূর্য্যমণ্ডল-সংস্থিতাম্ ॥"
(কারণ মধ্যাহ্নে গায়ত্রী মাতা বিষ্ণুরূপিণী)

সন্ধ্যায়:

"ওঁ সায়াহ্নে শিবরূপাঞ্চ, বৃদ্ধাং বৃষভ-বাহিনীম্।
সূর্য্য মণ্ডলমধ্যস্থাং সামবেদ-সমযুতাম্ ॥"
(কারণ বিকালে গায়ত্রী মাতা শিবরূপিণী)

কাজেই দেখা যাচ্ছে ত্রিসন্ধ্যায় গায়ত্রী সাধনার মাধ্যমে সাধক ত্রিদেবেরই সাধনা করছেন। আবার দেখুন অ, উ এবং ম্ –এই তিনটি বর্ণের সংযোগে "ওঁ" শব্দের উৎপত্তি। বেদ এবং উপনিষদে বর্ণিত আছে– "অ"=ব্রহ্মা, "উ"=বিষ্ণু এবং "ম"=মহেশ্বর বা শিব। আর এই ত্রিদেব মিলেই পরব্রহ্ম; আবার "ওঁ" ই প্রণব বা ওঁ-কার যা ব্রহ্ম সাধনার মন্ত্র, সমস্ত শুভ কর্ম, পূজা বা যজ্ঞের এবং অধিকাংশ মন্ত্রের প্রথম ধ্বনি।

গায়ত্রী জপের শুরুতেও তাই আবাহনের পূর্বে তিনবার 'ওঁ' বা 'ওঁম' উচ্চারণ করতে হয়। এই 'ওঁম' উচ্চারণের সময় জিহ্বাটি উল্টিয়ে গলার ভিতর যতটা সম্ভব প্রবেশ করিয়ে নিবেন এবং মনে মনে কল্পনা করবেন– "অউম্"-টির "অ" নাভির কাছ থেকে (ব্রহ্মা স্থানে) শুরু হচ্ছে। "উ" ধ্বনিটি বুকের মধ্যস্থল (বিষ্ণু স্থানে) এবং "ম" ধ্বনিটি কপালের মধ্যস্থলে (শিব ক্ষেত্রে) তৈরি হচ্ছে। প্রণব অর্থাৎ "ওঁ" বা "অ উ ম" সর্বদাই উচ্চকণ্ঠে সুন্দর ধ্বনিতে উচ্চারিত হওয়া উচিত। ক'দিন অভ্যাস করলেই এই তিন গ্রন্থিতে প্রণবের গমনাগমন অনুভব করতে পারবেন। "অ উ ম" একটু ধীরে ধীরে ও দীর্ঘ স্বরে উচ্চারণ করতে হয়। তাহলে ক'দিন পরেই আপন তিন গ্রন্থিতে প্রণবের কম্পন নিজেই অনুভব করতে পারবেন। প্রয়োজন মনে করলে কারও কাছ থেকে শিখে নিতে পারেন। প্রণবের এই কম্পনকে তরান্বিত ও বেগবান করার জন্যে চাইলে দিনে বা রাতে যেকোন সময় উপরিউক্ত পদ্ধতি "অ উ ম" বা "ওঁ" ধ্বনি করতে পারেন। কিছুদিনের মধ্যেই বুকের মধ্যে বিশ্বনাথের সাড়া পাবার আনন্দটি অনুভব করতে পারবেন।

এবারে গায়ত্রী জপের নিয়মটি বলছি– হাতের অবস্থান: সকালে জপকালে বুকের কাছে বাঁ হাত চিৎ করে রেখে, তার উপরে ডান হাত চিৎ করে গায়ত্রী জপ করবেন। দুপুরে বুকের সাথে ডান হাতকে লাগিয়ে তার পিঠে বাম হাত রেখে গায়ত্রী জপ করবেন। আবার সন্ধ্যার সময় বুকের কাছে ডান হাত উপুড় করে রেখে, তার উপর বাম হাতও উপুড় করে রাখুন এবং জপ শুরু করুন। উপবীত বা পৈতাধারীরা ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলির সাথে জড়িয়ে নিয়েই জপ করবেন। প্রতিবারেই কমপক্ষে দশবার গায়ত্রী জপ করবেন এবং পরে গায়ত্রী বিসর্জন করবেন।

এবারে গায়ত্রী জপের ছন্দটি বুঝাবার চেষ্টা করবো। মনে মনে নয়, উচ্চকণ্ঠে এবং উঁচু-নীচু নয়– একই মাত্রায় গায়ত্রী জপ করবেন। একবারে গায়ত্রী কতটুকু অংশ উচ্চারণ করবেন এবং কোথায় থামবেন সেটা বলছি–

"ওঁ, ওঁ, ওঁ (প্রলম্বিত স্বরে, নাভি থেকে শুরু করে বুক হয়ে কূটস্থ বা কপালের মধ্যস্থলে শেষ করবেন– এই হলো প্রণব) যা তিনবার করবেন।

পূর্ণ গায়ত্রী–একবার:

"ওঁ ভূঃ, ওঁ ভুবঃ, ওঁ স্বঃ, ওঁ মঃ, ওঁ তপঃ, ওঁ সত্যম্। (বিরতি)
ওঁ তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, ভর্গো দেবস্য ধীমহি। (বিরতি)
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ। (বিরতি)
ওঁ আপো জ্যোতির-সো২মৃতং ব্রহ্মভূর্ভুর্বঃ স্বরোম্।"

(এখানে '২'-এর উচ্চারণ নেই, 'সো' টা একটু দীর্ঘ হবে)

সাধারণ জপ কমপক্ষে দশবার, হাত রাখার পদ্ধতি আগেই বলা হয়েছে।

"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ। (বিরতি)
তৎসবিতুর্ব্বরেণ্যং, (আংশিক বিরতি)
ভর্গো দেবস্য ধীমহি। (পূর্ণ বিরতি)
ধিয়ো য়ো নঃ প্রচোদয়াৎ ওঁ ॥" (পূর্ণ বিরতি)

দশবার গণনার জন্যে আপনার ডান হাতকেই ব্যবহার করবেন, চোখ বন্ধ রাখবেন, মেরুদণ্ডসহ ঘাড় মাথা সোজা রাখবেন। বন্ধ চোখের অন্তর্দৃষ্টি কূটস্থের দিকে থাকবে, সুরের কোন ওঠানামা হবে না, ঢোল করতাল বা হারমোনিয়াম বাজানোর কোন সুযোগই নেই। সেই সাথে মন একাগ্র রাখবেন পরমপিতা পরমাত্মার প্রতি।

মনে রাখবেন, গায়ত্রী একটি অতি শক্তিশালী বৈদিক মন্ত্র, এটা কোন আধুনিক গান নয়। এটি একটি পরিপূর্ণ ব্রহ্ম-সাধন পন্থা। যেকোন ব্যক্তি যেকোন মতে বা গুরুর কাছে দীক্ষা নিলেও গায়ত্রী সাধনায় কোন বাধা নেই। কারণ ত্রিদেবসহ সকল দেবতা, মানুষ, জীবজগৎই পরমপিতার অংশ, সবার উপরে তার স্থান।

এবারে গায়ত্রী বিসর্জন:

জপ শেষ হবার পর এই মন্ত্র পড়ে গায়ত্রী বিসর্জন দিতে হয়–

"ওঁ মহেশ-বদনোৎপন্না, বিষ্ণোর্হৃদয় সম্ভবা।
ব্রহ্মনা সমনুজ্ঞাতা গচ্ছ দেবী যথেচ্ছায়া ॥"

এই বলে এক অঞ্জলি বা এক কুশী জল ভূমিতে ফেলুন। আবার–

"ওঁ অনেন জপেন ভগবন্তা-বাদিত্য-শুক্রৌ প্রায়েতাম্।
ওঁ আদিত্য-শুক্রভ্যাং নমঃ ॥"

এই মন্ত্র বলে এক অঞ্জলি বা এক কুশী জল ভূমিতে ফেলুন। ওঁ গুরবে নমঃ, ওঁ বিশ্ব দেবায় নমঃ, ওঁ পৃথিব্যৈই নমঃ – এই বলে প্রণাম করে জপ শেষ করেন। সময় এবং ইচ্ছা থাকলে এরপর ধ্যান করতে পারেন। ❑

বৈষ্ণবাচার্যগণের দার্শনিক মত ও ভক্তি-সাধন পদ্ধতি

স্বামী সুন্দরানন্দ

বৈষ্ণবাচার্যগণ সকলেই একবাক্যে ভক্তিযোগে সগুণ ব্রহ্ম বা ঈশ্বর উপাসনার মাহাত্ম্যকীর্তন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে ভক্তি পঞ্চম পুরুষার্থ। এই মহাপুরুষগণের দার্শনিক বিচারে পার্থক্য থাকিলেও তাঁহাদের প্রবর্তিত ভক্তিমূলক উপাসনা পদ্ধতি প্রায় একই প্রকার। বিশেষ এই যে, কেহ শান্ত, কেহ দাস্য, কেহ বাৎসল্য এবং কেহ মধুরভাবে ভগবানের উপাসনার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়েছেন।

আচার্য মধ্ব প্রচারিত দার্শনিক মত দ্বৈতবাদ স্বতন্ত্রসত্তাবাদ সবৈষ্ণববাদ বা পূর্ণপ্রজ্ঞদর্শন নামে অভিহিত এবং তাঁহার স্থাপিত সম্প্রদায় ব্রহ্মসম্প্রদায় চতুর্মুখসম্প্রদায় বা মাধ্বসম্প্রদায় নামে পরিচিত। মধ্ব দ্বৈতবাদের প্রথম প্রচারক না হইলেও এই মতবাদ তাঁহারই নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। বৈষ্ণবাচার্য শ্রীচৈতন্য বল্লভ নিম্বার্ক প্রমুখের প্রতিষ্ঠিত সম্প্রদায়ের উপর এই আচার্যের মতবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট।

মধ্বাচার্য জগতের মূলসত্তাকে স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র নামক দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। স্বতন্ত্র-সত্তা এক, অদ্বিতীয়, সর্বব্যাপী, সকল বিষয়ে পূর্ণ, অপরিবর্তনীয়, স্বয়ম্ভূ ও নিত্য। তিনি বিষ্ণুরূপে উপাসিত। আর অস্বতন্ত্র-সত্তা দেব ঋষি নর প্রমুখ জীব ও ভৌতিক পদার্থ। তাঁহারা পরিবর্তনশীল ও অনিত্য, কিন্তু মিথ্যা নহেন, পরন্তু সত্য। চেতন ও অচেতন সর্ববিধ অস্বতন্ত্র সংজ্ঞিত জীব ও পদার্থমাত্রই সকল বিষয়ে স্বতন্ত্র বিষ্ণুর উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। অস্বতন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ পৃথক স্বতন্ত্র-তত্ত্ব কী প্রকারে সর্বব্যাপী হইতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তরে মধ্ব বলেন, স্বতন্ত্র বিষ্ণু অস্বতন্ত্র জীব ও পদার্থ সমূহের কারণ হইয়াও দেশ-কাল-পাত্রাতীত। এজন্য তাঁহার সর্বব্যাপিত্ব সর্বাবস্থায় অক্ষুণ্ন।

মধ্বাচার্যের মতে এই দৃশ্যমান জগৎ পরিবর্তনশীল অর্থাৎ অনিত্য হইলেও সত্য। ইহা ভ্রমকল্পিত বা মিথ্যা নয়। কারণ সত্যসংকল্প ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। মায়াধীশ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ও নিত্যমুক্ত, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট জীব অল্পশক্তিমান অল্পজ্ঞ ও জন্মমৃত্যু পাশবদ্ধ এবং সর্বপ্রকারে তাঁহার সম্পূর্ণ অধীন।

মধ্বাচার্যের মতে এই দৃশ্যমান জগৎ পরিবর্তনশীল অর্থাৎ অনিত্য হইলেও সত্য। ইহা ভ্রমকল্পিত বা মিথ্যা নয়। কারণ সত্যসংকল্প ঈশ্বরের সৃষ্ট জগৎ মিথ্যা হইতে পারে না। মায়াধীশ ঈশ্বর সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ও নিত্যমুক্ত, কিন্তু তাঁহার সৃষ্ট জীব অল্পশক্তিমান অল্পজ্ঞ ও জন্মমৃত্যু পাশবদ্ধ এবং সর্বপ্রকারে তাঁহার সম্পূর্ণ অধীন।

মধ্ব-সিদ্ধান্তে ঈশ্বর প্রভু, জীব তাঁহার দাস। তাঁহার মতে জগতে পঞ্চবিধ ভেদ বিদ্যমান, যথা : (১) ঈশ্বরে ও জীবে ভেদ, (২) ঈশ্বরে ও জড়বস্তুতে ভেদ (৩) জীবে জীবে ভেদ (৪) জীব ও জড়বস্তুতে বা চেতন ও অচেতনে ভেদ (৫) এক জড়বস্তু হইতে অপর জড়বস্তু এবং ইহাদের বিভাগ-সমূহে ভেদ। তিনি বলেন, এই পঞ্চবিধ ভেদ বা স্বাতন্ত্র্য নষ্ট করিয়া ইহাদের অভেদ বা একত্ব সম্ভব নয়। মধ্বের মতে বৈকুণ্ঠে বিষ্ণুর সান্নিধ্যে নিত্যকাল বাস অথবা বিষ্ণুর সালোক্যলাভই মুক্তি। তিনি দাস্যভক্তিযোগে শ্রীবিষ্ণুর পূজা বন্দনা সেবা অংকন (তিলক ধারণ) শ্রবণ মনন নামজপ স্বাধ্যায় ধ্যান ও ভজনাদিকে মুক্তির উপায় বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।

বৈষ্ণবাচার্য রামানুজের ব্যাখ্যাত দার্শনিক মতের নাম বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ এবং তাঁহার প্রবর্তিত সম্প্রদায়ের নাম শ্রীসম্প্রদায়। তিনি বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রচারক হইলেও প্রবর্তয়িতা নহেন। কারণ, 'মহাভারত' 'ব্রহ্মসূত্র' 'বিষ্ণুপুরাণ' প্রভৃতিতে এই মতবাদ দৃষ্ট হয়। রামানুজের মতে চিৎ (জীব), অচিৎ (দৃশ্যমান জড়জগৎ), ঈশ্বর (পরমাত্মা) এই তিনই অদ্বিতীয় সর্বশক্তিমান স্বপ্রকাশ বিশ্বপতি পুরুষোত্তম বাসুদেবের রূপ। বাসুদেবই বেদান্তবেদ্য পরমব্রহ্ম। তিনি নিজেই নিজের সৃষ্টির উপাদান ও নিমিত্তকারণ। নিজরূপে নিমিত্তকারণ ও অংশরূপে উপাদানকারণ জীব ও জগৎ তাঁহার শরীর; এজন্য তিনি জীবজগদ বিশিষ্ট। চিৎ ও অচিৎ উভয়ের সহিত তাঁহার ভেদ অভেদ ভেদাভেদ এই তিন সম্বন্ধই বিদ্যমান।

রামানুজ-সিদ্ধান্তে পরমব্রহ্ম বহু কল্যাণগুণযুক্ত। এই গুণরূপ বিশেষণগুলি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নয়; গুণ ও গুণী যেমন অভেদ তদ্রূপ সগুণ ব্রহ্মই সত্য এবং শ্রুতিপ্রতিপাদ্য। তিনি বলেন, নির্গুণ ও নির্বিশেষ ব্রহ্মের অর্থ– ব্রহ্ম হইতে সকল গুণ বা বিশেষণ নির্গত হইয়াছে। ❑

"যোগচতুষ্টয়" থেকে সংকলিত।

সঠিক উচ্চারণে শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা পাঠ

বুলবুল ভৌমিক

অতীতের স্মৃতি রোমন্থন : পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ভাষা হচ্ছে সংস্কৃত। পৃথিবীর প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ ঋগ্বেদ থেকে আরম্ভ করে উপনিষদ, রামায়ণ, মহাভারত, ব্রহ্মসূত্র, বিবিধ পুরাণ ইত্যাদি শাস্ত্রগ্রন্থ এই ভাষায় রচিত হয়েছে। (বেদ, উপনিষদ প্রথমদিকে ছিল শিষ্য কর্তৃক গুরুর কাছে থেকে অধীত বিদ্যা বা শ্রুতি। পরবর্তীকালে তা লিপিবদ্ধ আকার ধারণ করে।) এতদ্ব্যতীত, বাণভট্ট, চরক, মনু, বাৎস্যায়ন, কালিদাস এবং অসংখ্য সাহিত্যিক, সমাজবিজ্ঞানী, চিকিৎসক তাঁদের অতুলনীয় সৃষ্টিকর্মও সংস্কৃত ভাষায়ই রচনা করেছেন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের পণ্ডিতবর্গ তাঁদের অতুলনীয় সৃষ্টিকর্মও সংস্কৃত ভাষায়ই রচনা করেছেন। প্রাচীনকালে ভারতবর্ষের পণ্ডিতবর্গ তাঁদের অনবদ্য রচনাভাণ্ডার সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমেই পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত করে গেছেন। হতভাগ্য আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে এ অমূল্য নিধি প্রাপ্ত হয়েও শুধুমাত্র সংস্কৃত ভাষার জ্ঞানের অভাবে সেই অমৃত সাগরে অবগাহন করতে অক্ষম।

বর্তমানের দৈন্যদশা : ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দের পূর্বে ভারতে যতটুকু সংস্কৃত চর্চা হত, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পরবর্তীকালে তাও নিম্নমুখী। অনেকের কাছেই সংস্কৃত একটি মৃত ভাষা। ভারতের একমাত্র উত্তরখণ্ডেই রাজ্যের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজির পাশাপাশি সংস্কৃতও ব্যবহৃত হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের (হিন্দু) জনসংখ্যা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পাচ্ছে। দু'একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত বিভাগ নামে একটা বিভাগে কিছুটা সংস্কৃত চর্চা হয়। স্কুল-কলেজে সংস্কৃত চর্চা অনুপস্থিত। আর সংস্কৃত শিক্ষার অন্যতম পাদপীঠ টোল-শিক্ষা বর্তমানে অস্তিত্বহীন বললেই সঠিক বলা হয়। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ যদিও হিন্দু অধ্যুষিত, কিন্তু সেখানকার অধিকাংশ হিন্দুর অতি-বামপন্থী মনোভাবের কারণে ধর্মের সাথে তাদের সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন বলা চলে। আর তাদের কাছে সংস্কৃত ভাষা একটি ভাষা হিসেবে কোন মর্যাদা পায়নি। সংস্কৃত ভাষাটি তাদের নিকট ধর্মীয় চর্চায় নিবেদিত পুষ্পাঞ্জলির মন্ত্র-মাধ্যমের চেয়ে বেশি কিছু নয়। সুতরাং অবহেলিত, অব্যবহৃত, অচর্চিত। কিন্তু বাঙালির সাথে সংস্কৃত ভাষার সম্পর্ক এককালে ঘনিষ্ঠই ছিল। বাঙালি ভক্তকবি জয়দেব কর্তৃক সংস্কৃত ভাষায় রচিত **"গীতগোবিন্দ"** সারা ভারতে আদরণীয়। মধুসূদন সরস্বতীর গীতাভাষ্য সকল গীতা পাঠকের শিরোধার্য। এমনকী, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান ছিল গভীর। শুধু হিন্দুরাই নন, ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লার সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান যে কোন হিন্দু পণ্ডিতের জন্য ঈর্ষণীয় ছিল। সৈয়দ মুজতবা আলী ছিলেন সংস্কৃত ভাষায় পারঙ্গম। কিন্তু বর্তমান কালে আমরা ধর্মের প্রতি অনীহা প্রদর্শন করে সংস্কৃত ভাষাকে করেছি অবহেলা। ফলস্বরূপ পৃথিবীর অন্যতম এক ঋদ্ধ ও উন্নত ভাষাতে অজ্ঞ হয়ে হাতের মুঠোয় অমৃতকুম্ভ থাকা সত্ত্বেও অমৃত পানে অসমর্থ। বর্তমানে মঠে-মন্দিরে শুধুমাত্র স্বামীজী-সন্ন্যাসীদের মধ্যেই সংস্কৃত ভাষার চর্চা সীমিত।

মধুসূদন সরস্বতীর গীতাভাষ্য সকল গীতা পাঠকের শিরোধার্য। এমনকী, সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান ছিল গভীর। শুধু হিন্দুরাই নন, ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লার সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান যে কোন হিন্দু পণ্ডিতের জন্য ঈর্ষণীয় ছিল।

ভূমিকা : এই নৈরাশ্যের অন্ধকারেও একটা ক্ষীণ আলোকরশ্মি দেখা যাচ্ছে। অনেক হিন্দু অন্যান্য শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠে আগ্রহী না হলেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মুখ-নিঃসৃত **"শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা"** পাঠে উৎসুক। বর্তমানে গীতার বহু বঙ্গানুবাদ থাকা সত্ত্বেও আগ্রহী ভক্তগণ সংস্কৃত ভাষার মূল শ্লোকগুলি পাঠ করতে ইচ্ছুক। কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত বিভিন্ন কারণে সংস্কৃত ভাষার অজ্ঞতার ফলে সঠিক ও শ্রুতিমধুরভাবে গীতা পাঠে অসমর্থ আমরা অনেকেই। স্বীয় অভিজ্ঞতার আলোকে এবং গীতার বিভিন্ন ব্যাখ্যা ও অনুবাদ পাঠ করে সঠিক উচ্চারণের জন্য কিছু কিছু নিয়মাবলি বা কৌশল একত্রীভূত করে এই প্রবন্ধের অবতারণা।

গীতা পাঠের সময় কতিপয় নিয়মাবলি স্মরণ রাখলে ও অনুসরণ করলে গীতা শুদ্ধভাবে এবং শ্রুতিমধুরভাবে উচ্চারণ করা সম্ভব এবং এর ফলে গীতা অনুধাবন করাও সহজসাধ্য হবে। যারা পাণিনির **"অষ্টাদশী"**, বা বোপদেবকৃত **"মুগ্ধবোধ"** বা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের **"সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী"** অধ্যয়ন করেছেন, তাদের জন্য নিম্নে উল্লিখিত কলা-কৌশলগুলি (techniques) অপর্যাপ্ত মনে হবে। আর যারা গীতার শ্লোকগুলির পদচ্ছেদ (সন্ধিবিচ্ছেদ বা সন্ধিহীন পাঠ) নিয়ে কোনরূপ চিন্তা-ভাবনা করেন না, তাদের নিকট এগুলি অপ্রয়োজনীয় প্রতীয়মান হবে। কিন্তু এ দু'পক্ষের মাঝখানে যারা আছেন অর্থাৎ যারা সংস্কৃত ভাষার কোন ব্যাকরণ বই পড়েন নি, কিন্তু কৌতূহলবশত সংস্কৃত ভাষার প্রাথমিক কিছু নিয়মাবলি জেনে সঠিক পদচ্ছেদের মাধ্যমে যথাযথভাবে গীতার শ্লোকগুলি পড়তে আগ্রহী, তাদের জন্য নিম্নোক্ত কলা-কৌশলগুলি কিছুটা তৃষ্ণা মিটাতে সক্ষম হবে বলে আশা করা যায়। নিম্নে পদচ্ছেদের এরূপ কতিপয় নিয়মাবলি ও উচ্চারণ বিধি বিভিন্ন পুস্তক থেকে সংগৃহীত করে পাঠক/পাঠিকাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত হল।

A) পদচ্ছেদ বিধি :

১) যদি প্রথম শব্দের শেষে "ম" থাকে এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটি কোন স্বরবর্ণের হয় তাহলে সংযুক্ত শব্দে "ম"-টি সেই স্বরবর্ণের আকারে যুক্ত হয়ে উচ্চারিত এবং লিখিত হয়। আর "ম" যদি বাক্যের শেষে থাকে তাহলে তার "ম্" হিসেবেই পদচ্ছেদ হবে এবং "ম্" হিসেবেই উচ্চারিত হবে।

উদাহরণ :

"ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।" = "ছেত্তুম্+অর্হসি+অশেষতঃ" (গীতা, ৬/৩৯)

"প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।" = "প্রোক্তবান্+অহম্+অব্যয়ম্।" (গীতা, ৪/১)

"চাব্যয়ম্।" = "চ+অব্যয়ম্।" (গীতা ১১/২)
"দিব্যমাদিদেবমজম্।" = "দিবম্+আদি+দেবম্+অজম্।" (গীতা, ১০/১২)
"তেনাহমিষ্টঃ।" = "তেন+অহম্+ইষ্টঃ।" (গীতা, ১৮/৭০)
"গোবিন্দমুক্তা।" = "গোবিন্দম্+উক্তা।" (গীতা, ২/৯)
"রূপমৈশ্বরম্।" = "রূপম্+ঐশ্বরম্।" (গীতা, ১১/৩)
"পুনর্মোহমেবম্।" = "পুনঃ+মোহাম্+এবম্।" (গীতা, ৪/৩৫)
"সর্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ।" = "সর্ব+হরশ্চ+অহম্+উদ্ভবশ্চ।" (গীতা, ১০/৩৪)
"মার্গশীর্ষোঽহমৃতূনাম্।" = "মার্গশীর্ষো+অহম্+ঋতূনাম্।" (গীতা, ১০/৩৫)
"জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্।" = "জ্ঞান+বিজ্ঞান+নাশনম্।" (গীতা, ৩/৪১)
"যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।" = "যত্তদ+বুদ্ধি+গ্রাহ্যম্+অতীন্দ্রিয়ম্।" (গীতা, ৪/২১)
২) কিন্তু "ম্" অক্ষরটি যদি বা কোন ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্বে থাকে, তাহলে "ম্" অক্ষরটি "ং" হিসাবে পদচ্ছেদ হয় এবং "অং" উচ্চারিত হবে।

উদাহরণ:
"প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ।" = "প্রকাশং+চ প্রবৃত্তিং+চ।" (গীতা, ১৪/২২)
"সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ।" = "সাধিভূত+অধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং+চ।" (গীতা, ৭/৩০)
৩) প্রথম শব্দটির শেষে ই-কার (ি) থাকলে এই ই-কারটি (ি) সংযুক্ত শব্দে য-ফলায় পরিবর্তিত হয়। দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটি স্বরবর্ণ হলে পরিবর্তিত য-ফলাটি দ্বিতীয় শব্দের প্রথমে অবস্থিত সেই স্বরবর্ণের রূপ ধারণ করে সংযুক্ত শব্দে।

উদাহরণ :
"হ্যপি।" = "হি+অপি।" (গীতা, ২/৬০)
"ইন্দ্রিয়াণ্যাদৌ।" = "ইন্দ্রিয়াণি+আদৌ।" (গীতা, ৩/৪১)
"আত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।" = "আত্মনি+এব+অবতিষ্ঠতে।" (গীতা, ৬/১৮)
"হ্যুপপদ্যতে।" = "হি+উপপদ্যতে।" (গীতা, ৬/৩৯)
৪) প্রথম শব্দের শেষে "খণ্ড-ত" (ৎ)-টি থাকলে এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটি স্বরবর্ণের হলে সংযুক্ত শব্দে "খণ্ড-ত" (ৎ)-টি "দ"-এর রূপ ধারণ করে এবং পরিবর্তিত "দ"-টি দ্বিতীয় শব্দের সেই স্বরবর্ণের আকার ধারণ করে।

উদাহরণ :
"যদশ্নাসি।" = "যৎ+অশ্নাসি।" (গীতা, ৯/২৭)
"উদাসীনবদাসীনম্।" = "উদাসীনবৎ+আসীনম্।" (গীতা, ৯/৯)
"এতাবদিতি।" = "এতাবৎ+ইতি।" (গীতা, ১৬/১১)
"তস্মাদুত্তিষ্ঠ।" = "তস্মাৎ+উত্তিষ্ঠ।" (গীতা, ২/৩৭)
"শ্রীমদূর্জিতমেব।" = "শ্রীমৎ+ঊর্জিতমেব।" (গীতা, ১০/৪১)
"তত্তদেবাবগচ্ছ।" = "তৎ+তৎ+এব+অবগচ্ছ" (গীতা, ১০/৪১)
"সর্বমেতদৃতম্।" = "সর্বমেতৎ+ঋতম।" (গীতা, ১০/১৪)
৫) প্রথম শব্দের শেষে "খণ্ড-ত" (ৎ) থাকলে এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথমে কোন ব্যঞ্জন বর্ণ থাকলে সংযুক্ত শব্দে প্রথম শব্দের "খণ্ড-ত" (ৎ)-টি দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটির রূপ (অর্থাৎ দ্বিত্ব) ধারণ করে।

উদাহরণ :
"যচ্চাপি।" = "তৎ+চ+অপি।" (গীতা, ১০/৩৯)
"তজ্জ্যোতি।" = "তৎ+জ্যোতি।" (গীতা, ১৩/১৭)
"যত্তৎ।" = "যৎ+তৎ।" (গীতা, ১৮/৩৮)
"তদ্দানং।" = "তৎ+দানং।" (গীতা, ১৭/২০)
"তন্নিবধ্নাতি।" = "তৎ+নিবধ্নাতি।" (গীতা, ১৪/৮)
ব্যতিক্রম : (i) প্রথম শব্দের শেষে "খণ্ড-ত" (ৎ) থাকলে এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষর "শ" থাকলে প্রথম শব্দের "খণ্ড-ত" (ৎ)-টি "চ"-তে পরিবর্তিত হয় এবং দ্বিতীয় শব্দের "শ"-টি "ছ"-তে পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণ :
"যচ্ছোকমুচ্ছোষণম্।" = "যৎ+শোকম্+উৎ+শোষণম্।" (গীতা, ২/৮)
"যচ্ছ্রদ্ধঃ।" = "যৎ+শ্রদ্ধঃ।" (গীতা, ১৭/৩)
"যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ।" = "যুদ্ধাৎ+শ্রেয়োঽন্যৎ।" (গীতা, ২/৩১)
(ii) দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটি "ম" থাকলে সংযুক্ত শব্দে "ম"-টি "ন"-তে পরিবর্তিত হয়।

উদাহরণ :
"কশ্চিন্মাম্।" = "কশ্চিৎ+মাম্।" (গীতা, ৭/৩)
(iii) দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটি "ধ" বা "ভ" থাকলে সংযুক্ত শব্দে প্রথম শব্দের শেষ অক্ষর "খণ্ড-ত" (ৎ)-টি "দ"তে পরিবর্তিত হয় কিন্তু দ্বিত্ব হয় না।

উদাহরণ :
"বুদ্ধিযোগাদ্ধনঞ্জয়" = "বুদ্ধিযোগাৎ+ধনঞ্জয়।" (গীতা, ২/৪৯)
"ক্রোধাদ্ভবতি।" = "ক্রোধাৎ+ভবতি।" (গীতা, ২/৬৩)
(iv) নিয়ম-বিহির্ভূত (নিপাতনে সিদ্ধ)।

উদাহরণ :
"বৃহস্পতিম্।" = "বৃহৎ+পতিম্।" (গীতা, ১০/২৪)
৬) প্রথম শব্দের শেষ অক্ষরটি "খণ্ড-ত" (ৎ) হলে এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটি "য" হলে সংযুক্ত শব্দে "খণ্ড-ত" (ৎ)টি "দ" এবং "য"-টি "য-ফলা"-য় পরিবর্তিত হয় এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটিতে কোন স্বরবর্ণ থাকলে সেই স্বরবর্ণের আকার ধারণ করে।

উদাহরণ :
"ভবেদ্যুগপদুত্থিতা" = "ভবেৎ+যুগপৎ+উত্থিতা।" (গীতা, ১১/১২)
৭) প্রথম শব্দের শেষ অক্ষরটি স্বরবর্ণে উচ্চারিত হলে এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটি "এ" থাকলে উভয় স্বরবর্ণ মিলে "ঐ"-কারে পরিবর্তিত হয়। [সূত্রঃ অ+এ = ঐ, আ+এ+ঐ]

উদাহরণ :
"চৈব।" = "চ+এব।" (গীতা, ৮/১০)
"তত্রৈবাব্যক্ত।" = "তত্র+এব+অব্যক্ত। (গীতা, ৮/১৮)
"বহুনৈতেন।" = "বহুনা+এতেন।" (গীতা, ১০/৪২)
৮) প্রথম শব্দের শেষ অক্ষরটি "অ"-কার উচ্চারিত হলে বা আকার (া) থাকলে এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটি "অ"-কার উচ্চারিত হলে বা "আ" (া) থাকলে সংযুক্ত শব্দটিতে এই দুই সংযুক্ত বর্ণ মিলে "আ" (া)-এ পরিবর্তিত হবে। [সূত্র : অ+অ = আ, অ+আ = আ, আ+অ = আ, আ+আ = আ]

উদাহরণ :
"ভীমার্জুন।" = "ভীম+অর্জুন।" (গীতা, ১/৪)

"বিষ্টভ্যাহমিদম্।" = "বিষ্টভ্য+অহম্+ইদম্।" (গীতা, ১০/৪২)
"অশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।" = "অশ্রুপূর্ণ+আকুলেক্ষণম্। (গীতা, ২/১)
"মহানুভাবান্।"= "মহা+অনুভাবান্।" (গীতা, ১৩/৩৩)
৯) প্রথম শব্দটি স্বরবর্ণের উচ্চারণে সমাপ্ত হলে এবং দ্বিতীয় শব্দটি ই-কার (ি) দিয়ে আরম্ভ হলে সংযুক্ত শব্দটি এ-কারে (ে) পরিবর্তিত হয়। [সূত্র : অ+ই = এ, আ+ই = এ]

উদাহরণ :
"তবেদম্।" = "তব+ইদম।" (গীতা, ১১/২০)
"সখেব।" = "সখা+ইব।" (গীতা, ১১/৪৪)
১০) প্রথম শব্দের শেষ অক্ষরটি "য়ি" থাকলে এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটি স্বরবর্ণ হলে সংযুক্ত শব্দে প্রথম শব্দের "য়ি" শব্দটি "য্য"-তে রূপান্তরিত হয় এবং দ্বিতীয় শব্দের স্বরবর্ণের আকারটি গ্রহণ করে। [সূত্র : য়ি+অ = য্য, য়ি+আ = য্যা, য়ি+এ = য্যে]

উদাহরণ :
"ময্যার্পিত।" = "ময়ি+অর্পিত।" (গীতা, ১২/১৪)
"ময্যাবেশ্য।" = "ময়ি+আবেশ্য।" (গীতা, ১২/২)
"ত্বয্যুপপদ্যতে।" = "ত্বয়ি+উপপ্যতে।" (গীতা, ২/৩)
"ময্যেব।" = "ময়ি+এব।" (গীতা, ১২/৮)
১১) প্রথম শব্দের শেষ অক্ষরটি উ-কার (ু) যুক্ত হলে এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটি স্বরবর্ণ হলে প্রথম শব্দের শেষ অক্ষরের উ-কার (ু) সংযুক্ত শব্দে ব-ফলায় (অন্তঃস্থ-ব) পরিবর্তিত হয় এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরের স্বরবর্ণের রূপ ধারণ করে।

উদাহরণ :
"ত্বেবম্।" = "তু+এবম্।" (গীতা, ১৩/২৬)
"বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তম্।"="বিনশ্যৎসু+অবিনশ্যন্তম্।" (গীতা, ১৩/২৮)
১২) চ-বর্গের (চ, ছ, জ, ঝ, ঞ) পরে "ন" থাকলে সংযুক্ত শব্দে "ঞ" হয়।

উদাহরণ :
"যজ্ঞঃ।" = "যজ্+নঃ।" (গীতা, ৩/১৪)
১৩) প্রথম শব্দের শেষে "ন" থাকলে এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথমে "ল" থাকলে সংযুক্ত শব্দে "ন"-টি চন্দ্রবিন্দু (ঁ)-তে পরিণত হয় এবং দ্বিতীয় শব্দের "ল" অক্ষরটি দ্বিত্ব হয়।

উদাহরণ :
ইমাঁল্লোকান্।" = "ইমান্+লোকান্" (গীতা, ১৮/১৭)
১৪) (ক) প্রথম শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকলে এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটি স্বরবর্ণের হলে সংযুক্ত শব্দে প্রথম শব্দের বিসর্গটি "র"-তে পরিবর্তিত হয় এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরের স্বরবর্ণের আকার ধারণ করে।

উদাহরণ :
"সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে"="সেনয়োঃ+উভয়োঃ+মধ্যে।" (গীতা, ১/২১,১/২৪)
"সেনয়োরুভয়োরপি।" = "সেনয়োঃ+উভয়োঃ+অপি।" (গীতা, ১/২৬)
"বুদ্ধিরেকেহ।" = "বুদ্ধিঃ+একা+ইহ।" (গীতা, ২/৪১)
(খ) প্রথম শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকলে এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথম অক্ষরটি ব্যঞ্জনবর্ণের হলে সংযুক্ত শব্দে প্রথম শব্দের বিসর্গটি "রেফ"-তে পরিবর্তিত হয়।
"শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে।" = "শ্বেতৈঃ+হয়ৈঃ+যুক্তে।" (গীতা, ১/১৪)
"কর্মফলহেতুর্ভূর্মা।" = "কর্মফলহেতুঃ+ভূঃ+মা।" (গীতা, ২/৪৭)
(গ) প্রথম শব্দের শেষে বিসর্গ থাকলে এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথমে "ত" বা "থ" থাকলে সংযুক্ত শব্দে বিসর্গটি "স"-তে রূপান্তরিত হয়।

উদাহরণ :
"দুর্যোধনস্তদা।" = "দুর্যোধনঃ+তদা।" (গীতা, ১/২)
"নিস্ত্রৈগুণ্যো।" = "নিঃ+ত্রৈগুণ্যো।" (গীতা, ২/৪৫)
(ঘ) প্রথম শব্দের শেষে বিসর্গ থাকলে এবং দ্বিতীয় শব্দের প্রথমে "চ" বা "ছ" থাকলে সংযুক্ত শব্দে বিসর্গটি "শ"-তে রূপান্তরিত হয়।

উদাহরণ :
"পাণ্ডবাশ্চৈব।" = "পাণ্ডবাঃ+চৈব।" (গীতা, ১/১)

B) উচ্চারণ বিধি :
১) গীতায় অনেক সংস্কৃত শ্লোকে "অর্ধমাত্রা হ বা লুপ্ত অ-কার (ঽ)" পরিলক্ষিত হয়। সংস্কৃত ভাষায় এই "অর্ধমাত্রা হ" ব্যবহৃত হলেও বাংলা ভাষায় এই "অর্ধমাত্রা হ" ব্যবহৃত হয় না। পদচ্ছেদ করলে এই "অর্ধমাত্রা হ" "অ" হিসেবেই উচ্চারিত হয়।

উদাহরণ :
"অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য।" = "অনাশিনো+অপ্রমেয়স্য।" (গীতা, ২/১৮)
"পুরুষোঽশ্নুতে।" = "পুরুষো+অশ্নুতে।" (গীতা, ৩/৪)
২) মূল শব্দে উহ্য "অ"-টি অনেক সময় অতীত কালের নির্দেশক।

উদাহরণ :
"কিমকুর্বত।" = "কিম্+অকুর্বত।" (গীতা, ১/১) (কী করেছিল? কী করলো?)
পিতামহ ভীষ্ম দশদিন যুদ্ধ করে শরশয্যায় শায়িত হলে সঞ্জয় কুরুক্ষেত্র থেকে ফিরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকট গমন করেন। তখন ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে অমাত্য সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে কুরুক্ষেত্রের ঘটনাবলি (শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক অর্জুনকে প্রদত্ত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার উপদেশাবলিসহ) শোনান। সেজন্য গীতার উপদেশ তাৎক্ষণিক (real-time) ভাবে সঞ্জয় কর্তৃক বর্ণিত হয়নি বরং বলা যায় দশ দিনের অতীত কাহিনী। (মহাভারত, ভীষ্মপর্ব/১৩, পৃঃ ৯৫৭) সেজন্যে "কুর্বত" শব্দের পূর্বে "অ" অক্ষরটির সংযোগ অতীত কালের (দশ দিন পূর্বের) নির্দেশক।
৩) আবার কোন কোন ক্ষেত্রে উহ্য "অ"-টি বিপরীত অবস্থার নির্দেশক।

উদাহরণ :
"অভ্যুত্থানমধর্মস্য।" = "অভ্যুত্থানম্+অধর্মস্য।" (গীতা, ৪/৭) ধর্ম শব্দটির পূর্বে "অ" অক্ষরটির অবস্থান ধর্মের অভাব বা বিপরীত অবস্থার (অধর্ম) নির্দেশ করে।
৪) "ব্রহ্ম" শব্দটির উচ্চারণ হবে "ব্রোম্‌হো", "ব্রহ্‌মো" নয়। বাংলা এবং সংস্কৃত উভয় ভাষায় উচ্চারণটি একই হবে।
৫) বাংলা ভাষায় বর্তমান কালে "অন্তঃস্থ-ব" –এর ব্যবহার হয় না। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় "বর্গীয় ব" এবং "অন্তঃস্থ-ব" –এই দুই "ব"–এর ব্যবহারই প্রচলিত আছে। গীতার যেসব শ্লোকে "অন্তঃস্থ-ব"–এর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়, সেখানে উচ্চারণটিও ভিন্ন রকমের হবে।

উদাহরণ :
"ত্বাং"–এর (গীতা, ১৮/৬৬) উচ্চারণ হবে "তোয়াং" (অকেটা

Twang–এর ন্যায়, "তাং" নয়)।
৬) বিসর্গ (ঃ) "অর্ধ হ"–কারের ন্যায় উচ্চারিত হবে।

উদাহরণ :
"ততঃ।" = "তৎহ।" (গীতা, ১/১৪)
"দুঃখে।" = "দুহ্‌খে।" (গীতা, ২/৩৮)
৭) য-এর উচ্চারণ "ই+অ।"

উদাহরণ :
"যদা।" = "ইঅদা।" (গীতা, ২/৫২)
৮) "ম" কোন অক্ষরের নীচে অবস্থান করলে "ম"–এর উচ্চারণ পুরোপুরি "ম" হিসেবে করা যায় বা চন্দ্রবিন্দু (ঁ) সহযোগেও উচ্চারণ করা যায়।

উদাহরণ :
"আত্মনি।" = "আৎমনি।" অথবা "আত্‌তোঁনি।" (গীতা, ২/৫৫)
৯) "শ"–এর সাথে র-ফলা যুক্ত হলে "শ"–এর উচ্চারণ "স"–এর ন্যায় হবে।

উদাহরণ :
"শ্রীভগবান্ উবাচ" = "স্রীভগবান্ উবাচ।" (গীতা, বিভিন্ন স্থানে)
উচ্চারণ-প্রমাদের ফল : যে কোন শব্দ উচ্চারণের সময় তা সঠিকভাবে উচ্চারণ করা আবশ্যক। তা না হলে তা যে শুধু শ্রুতির ব্যাঘাত ঘটায় তা-ই নয়, অনেক সময় তা অর্থেরও অনর্থ ঘটাতে পারে। নিম্নে এরূপ কতিপয় উদাহরণের অবতারণা করা হল।

(i) বিপরীত অর্থ : একটা উদাহরণের সাহায্যে ব্যাপারটা সুস্পষ্ট করা দরকার।

"যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥" (গীতা, ৪/৭)

বঙ্গানুবাদে যাবার পূর্বে "অভ্যুত্থানমধর্মস্য।" শব্দটির পদচ্ছেদ করা দরকার। যারা সংস্কৃত ভাষাটি সম্পর্কে জ্ঞাত নন, তারা অনেকে "অভ্যুত্থানম্ ধর্মস্য।" অর্থাৎ "ধর্মের অভ্যুত্থান" এরকম পাঠ করেন। বাস্তবে অনেক সময়ই এরকম উচ্চারণ শোনা যায়। এখন শ্লোকটির বঙ্গানুবাদ করা যাক। "হে ভারত! যখনই যখনই ধর্মের গ্লানি এবং অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, তখন আমি নিজেকে সৃষ্টি করি।" তাহলে প্রমাণ হচ্ছে, "অভ্যুত্থানমধর্মস্য।" শব্দটির সঠিক পদচ্ছেদ হবে, "অভ্যুত্থানম্-অধর্মস্য।" অর্থাৎ "অধর্মের অভ্যুত্থান।"

(ii) অর্থের পরিবর্তন : শব্দের উচ্চারণের কারণে শব্দ বা শ্লোকের অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। আরেকটা উদাহরণ নেয়া যাক। "আপনি কি খাবেন?" এই বাক্যটির কোন্ শব্দের উপর উচ্চারণের গুরুত্ব দিলে অর্থের কিরূপ পরিবর্তন ঘটে তা নিম্নে প্রদর্শিত হল।
(১) "আপনি কি খাবেন?"–এখানে "খাবেন" শব্দটির উপর উচ্চারণের জোর বা গুরুত্ব দেয়ার ফলে উত্তরটি হবে "হ্যাঁ বা না।" অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা কোন একজনকে জিজ্ঞাসা করছেন উনি খাবেন কি-না।
(২) "আপনি কি খাবেন?"–এখানে "কি" শব্দটির উপর উচ্চারণের জোর বা গুরুত্ব দেয়ার ফলে উত্তর হবে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কোন্ খাদ্য খাবেন। অর্থাৎ প্রশ্নকর্তা ইতিমধ্যে নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি খেতে ইচ্ছুক। এখন প্রশ্নকর্তা জিজ্ঞাসা করছেন যে, জিজ্ঞাসিত ব্যক্তি কোন্ খাদ্য (রুটি, ভাত, লুচি ইত্যাদি) পছন্দ করবেন।

(iii) হিতে বিপরীত : আরেকটি আখ্যায়িকার সাহায্যে প্রমাণ করা যায় যে, উচ্চাণের বিপত্তি হলে হিতে বিপরীত হতে পারে। দেবরাজ ইন্দ্র ত্বষ্টার পুত্র ত্রিশিরা বা বিশ্বরূপকে হত্যা করেছিলেন। পুত্রহত্যার প্রতিশোধ নেবার জন্য ত্বষ্টা "ইন্দ্রশত্রুবর্দ্ধস্ব" এই মন্ত্রে প্রতিদিন যজ্ঞে আহুতি প্রদান করছিলেন যেন ত্বষ্টার এমন এক পুত্র (বৃত্রাসুর) জন্মায় যে ইন্দ্রকে হত্যা করতে সক্ষম হবে। যদি প্রথম শব্দাংশের (ইন্দ্র) উপর জোর দেয়া হয়, তাহলে বহুব্রীহি সমাস হয় এবং অর্থ দাঁড়ায় "ইন্দ্র যার শত্রু" (ইন্দ্রঃ শত্রুঃ যস্য) অর্থাৎ ইন্দ্রের বলবৃদ্ধি হউক। আর যদি শব্দের দ্বিতীয়াংশের (শত্রু) উপর জোর দেয়া হয়, তাহলে তৎপুরুষ সমাস হয় এবং অর্থ দাঁড়ায় "যিনি ইন্দ্রের শত্রু বা ঘাতক" (ইন্দ্রস্য শত্রু) অর্থাৎ বৃত্রাসুরের বলবৃদ্ধি হউক। বৃত্রাসুরের পিতা ত্বষ্টা ভুল করে প্রতিদিন মন্ত্রের আদিতে (ইন্দ্র শব্দের উপর) উদাত্ত (জোর) ব্যবহার করেছিলেন। ফলে মন্ত্রটির অর্থ বিপরীত হয়ে দাঁড়ায় এবং বৃত্রাসুরের পরিবর্তে ইন্দ্র বলবান হন এবং বৃত্রাসুরকে হত্যা করেন। (বেদ পরিচয়, পৃঃ ৪০; হিন্দুদের দেবদেবী – উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ, প্রথমপর্ব, পৃঃ ১৭২; বেদ-বিচিন্তন পৃঃ ৩৯)

সহায়ক গ্রন্থাবলি :
১) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (পদচ্ছেদে) – সম্পাদনা: শ্রীমৎ স্বামী পূর্ণানন্দ পুরী মহারাজ, শ্রীশ্রী অদ্বৈতানন্দ ঋষিমঠ ও মিশন, দক্ষিণ জলদী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম. ১৪০৫ বঙ্গাব্দ
২) বাংলা উচ্চারণ অভিধান – নরেন বিশ্বাস, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ (১৯৯০ খ্রিষ্টাব্দ)
৩) শব্দসার (সংস্কৃত বাঙ্গলা-অভিধান) – কঙ্কলনঃ গিরিশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কোলকাতা, ২০০৩ খ্রিষ্টাব্দ।
৪) সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী – পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (সম্পাদনা : পণ্ডিত হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য), চলন্তিকা প্রকাশক, কলকাতা, ১৪১৬ বঙ্গাব্দ
৫) বঙ্গীয় শব্দকোষ– হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্য অকাদেমি, নতুন দিল্লি, ২০১৬ খ্রিষ্টাব্দ
৬) সরল বাঙ্গালা অভিধান – সংকলনঃ সুবলচন্দ্র মিত্র, নিউ বেঙ্গল প্রেস (প্রাঃ) লিঃ কলিকাতা, ১৯৯৫ খ্রিষ্টাব্দ
৭) উপনিষদ্ গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) - সম্পাদনা: স্বামী গম্ভীরানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলিকাতা ১৩৯৩ বঙ্গাব্দ (১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দ)
৮) হিন্দুদের দেবদেবী – উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ (প্রথমপর্ব)– ডঃ হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০১০ খ্রিষ্টাব্দ
৯) বেদের পরিচয় – ডঃ যোগীরাজ বসু, ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড, কোলকাতা, ২০১৫ খ্রিষ্টাব্দ
১০) বেদ-বেদান্ত (বেদ-বিচিন্তন) – ডঃ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী, মহানামব্রত কালচারাল এন্ড ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট, কলিকাতা, ২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ
১১) ব্যাকরণ কণিকা – স্বামী অমলানন্দ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ (২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ)
১২) ব্যাসদেব বিরচিত মহাভারত (রাজ সংস্করণ) – অনুবাদঃ কালীপ্রসন্ন সিংহ, তুলি-কলম, কলকাতা, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ (২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ)

নিউ ইয়র্ক, নভেম্বর ১১, ২০১৭ - ডিসেম্বর ০৫, ২০১৭। ❑

যুব-সমাজের প্রতি সম্ভাষণ

[চতুর্থ ভাষণ]

ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারী

[ভারতীয় অধ্যাত্ম চিন্তাধারার ধারক ও বাহক, সর্বজনপূজ্য পণ্ডিতাগ্রগণ্য আচার্য্য শ্রীশ্রীমহানামব্রত ব্রহ্মচারী মহাশয় মাঝে মাঝে ত্রিপুরায় যাইয়া বিভিন্ন বিষয়ের উপর সারগর্ভ ভাষণ দিতেন। আগরতলার উষাকান্ত একাডেমীর প্রধান শিক্ষক শ্রীশিতিকণ্ঠ সেনগুপ্ত মহাশয় ভাষণগুলির মধ্যে পাঁচটি নির্বাচনক্রমে একটি মালা রচনা করিয়াছেন। সংবদ্ধ পাঁচটি ভাষণই নিঃসন্দেহে যুগোপযোগী। দিকে দিকে আজ সামগ্রিক অবক্ষয়ের সুস্পষ্ট ছাপ। সীমাহীন ভোগের মধ্যেও আজ বিশ্বব্যাপী একটা অশান্তি, নৈরাশ্য ও আর্তনাদ। সর্বস্তরের উদ্‌ভ্রান্ত মানব বর্তমানের নিরবচ্ছিন্ন ভ্রান্তপথে চলিতে চলিতে ক্ষণিকের তরে অবকাশ নিয়া যদি এই পাঁচটি ভাষণ পাঠ ও উপলব্ধির চেষ্টা করে, তবে আর যাই হউক না কেন একটু নিভৃত কল্যাণ-চিন্তার অবকাশ যে তাহাদের ভাগ্যে জুটিবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বিশেষ করিয়া এই পাঁচটি ভাষণ ছাত্র ও শিক্ষক সমাজের সামনে একটি নূতন দৃষ্টি ভঙ্গি খুলিয়া দিবে।]

সময়কাল : ১৯৬২–৬৩, স্থান : আগরতলা, ত্রিপুরা, ভারত।

বছরাবধি আমরা রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব পালন করছি। বিবেকানন্দের উৎসব, নেতাজীর উৎসব তাও হচ্ছে শত শত। আবার তার পাশেই কলিকাতার বুকের উপর আজ ক'দিন ধরেই চলছে রক্তাক্ত উৎসব। তাই মনে হয়— বিবেকানন্দ, নেতাজী, রবীন্দ্রনাথ— এঁদের উৎসব আমাদের কাছে যেন বিড়ম্বনা। যে জাতি এই সব মহামানবদের উৎসব করে, তার পক্ষে এটা যে কত বড় লজ্জার, কত ঘৃণার, তা বলবার নয়।

স্বামীজী বলে গেলেন— "কটিমাত্র বস্ত্রাবৃত হইয়া সদর্পে ডাকিয়া বল— ভারতবাসী আমার ভাই..." সেই ভারতবর্ষের লোক হয়ে আজ আমরা কি নিষ্ঠুর দ্বন্দ্ব করছি! নেতাজী, যিনি সমস্ত হিন্দু মুসলমান এক করে আজাদ্ হিন্দ্ ফৌজ গড়েছিলেন তাঁর উৎসব করছি, অথচ ভাইয়ের রক্তে হস্ত রঞ্জিত করতে মোটেই লজ্জা বোধ করছি না। রবীন্দ্রনাথ শুনিয়ে গেলেন—

"এসো হে আর্য্য, এসো অনার্য্য, হিন্দু মুসলমান;
এসো এসো আজ, তুমি ইংরাজ, এসো এসো খ্রিষ্টান,
এস ব্রাহ্মণ শুচি করি মন, ধরো হাত সবাকার
... ...
সবার পরশে পবিত্র করা তীর্থ নীরে"

আর আমরা সবাই মিলে খুনোখুনি করতে মোটেই ইতস্তত করছি না। এ যেন নিজেদের অপমান করছি। সর্বধর্ম-সমন্বয় করেছিলেন যিনি, কলিকাতার বুকের উপর দক্ষিণেশ্বরেই ছিল তাঁর আসন। আজ সেখানে ধর্মের নামে মানুষ মানুষের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ছে। সুতরাং আমরা যে উৎসব করি তা সবই কৃত্রিম, অন্তরের সাড়া জাগে না মোটেই। গুরুভার একটা জগদ্দল পাথর যেন আমাদের বুকে চেপে আছে। কি যেন একটা মহাপাপ, অজ্ঞতা বা নির্বুদ্ধিতা যেন শত শত উৎসাহকে চেপে রেখে হিংসা, বিদ্বেষের জন্ম দিচ্ছে।

> বিজ্ঞানের মোটামুটি দুটি ভাগ— pure science বা শুদ্ধ বিজ্ঞান এবং অপরটি applied science অর্থাৎ কার্যে প্রযুক্ত বিজ্ঞান। শুদ্ধ বিজ্ঞান কেবল সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করে; তারপর অপর দলটি সে সব বৈজ্ঞানিক সত্যকে মানুষের উপযোগী করে কাজে লাগায়।

সাম্প্রতিক কলকাতার কথা উল্লেখ করেই যদিও বললাম, কিন্তু বিষয়টা মোটেই সাম্প্রতিক নয়। পৃথিবীর সর্বত্রই আজ মানুষে মানুষে হানাহানি, রক্তারক্তি, মারামারি, কাটাকাটি, যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই আছে। এত দুঃখ, এত দুঃখসময় মানুষের জীবনে আর কখনও এসেছে কি না জানি না। আন্তর্জাতিক, রাষ্ট্রীয়, সামাজিক, পারিবারিক— সকল ক্ষেত্রেই আজ উদ্বেগ, অশান্তি আর উচ্ছৃঙ্খলতা। এ সমস্যার কি কোন সমাধান নেই?

সমাধানের চেষ্টা যাঁরা করেন তাঁদের মধ্যে একটি বড় দল হলেন সাম্যবাদী। তাঁরা মানুষে মানুষে সমান করে দেন। খাদ্য সামগ্রী মানুষের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেন। সকলের রাজনৈতিক অধিকার সমান করে দেন। তাঁদের কথা হল— এসব অসাম্যই সমস্ত অমঙ্গলের হেতু। মানুষের যোগ্যতা, অধিকার, সামাজিক দাবি ইত্যাদি সমান হউক। ধনী-দরিদ্র, ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সব সমান হয়ে থাক— এই তাঁদের কাম্য। এভাবে সমান হলেই জগতে শান্তি স্থাপিত হবে— এই তাঁদের কথা। আর তারই পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আমরা দাবি করি— বিষয়টি আরও একটু গভীর করে ভাবা যায় না কি? আমাদের জীবনের মধ্যে দেহ এবং আত্মা এ দু'য়ের সন্ধান আছে। আমরা বলি— দেহের প্রয়োজন এবং আত্মার প্রয়োজন এ দুটো সমান হওয়া দরকার। দেহের খাদ্যই আমরা সন্ধান করি দিনরাত, কিন্তু আত্মার খাদ্যের কোন অনুসন্ধান নেই। দেহের যে সব প্রয়োজন, সে প্রয়োজন নিয়েই আমরা মশগুল হয়ে আছি সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত। আত্মার কোনো খবর নেই। আত্মা যে আছে এবং তারও যে কোন প্রয়োজন থাকতে পারে, একথা আমাদের ভাবনার মধ্যেই আসে না। কোনো শিক্ষার বা কোনো প্রতিষ্ঠানেই আত্মার খোঁজ করা হয় না। এই যে আত্মা এবং দেহের বৈষম্য, এতেই জীবনের সাম্য নষ্ট হয়েছে। আমাদের শাস্ত্রীয় দৃষ্টিতে এ সাম্যভঙ্গই সমস্ত দুঃখের হেতু। এ ভারসাম্য নষ্ট হবার কারণ, আত্মা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বে আমাদের বিশ্বাস

নেই। পরমাত্মা, পরমেশ্বর বলে কোনো কিছু আমরা মানতে রাজি নই। কিন্তু দেহের যেমনি প্রয়োজন খাদ্যের, আত্মারও তেমনি প্রয়োজন ঈশ্বরের। অন্ন-ব্যঞ্জনের জন্য দেহের যেমন তাগিদ আছে, অন্তরাত্মার ভিতরও পরমাত্মার স্পর্শ লাভের, তা থেকে অমৃত আস্বাদনের একটা লালসা আছে। সে লালসা আজ আমাদের শুকিয়ে গেছে। আত্মার ক্ষুধা নেই, তাই পরমাত্মারও অনুসন্ধান নেই। সংক্ষেপে বলা চলে— ঈশ্বরসত্তায় আমাদের যে আস্থা ছিল, তা দিনের পর দিন ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। এর মূলে রয়েছে বর্তমান যুগের বিজ্ঞান অর্থাৎ পাশ্চাত্য বিজ্ঞান। তা বলে Pure science কিন্তু এর জন্য মোটেই দায়ী নয়।

গত তিন শত বছর ধরে বিজ্ঞান অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে; ফলে আমাদের সমাজের রূপটি যেন সম্পূর্ণ বদলে যাচ্ছে। বিজ্ঞান আমাদের প্রভূত উপকার সাধন করেছে। আগে আমরা ঘণ্টায় ৪ মাইলের বেশি চলতে পারতাম না, আর আজ ঘণ্টায় ৪০০ মাইলেরও বেশি চলতে পারি। আগে জোরে চিৎকার করেও ২০০ হাত দূরের লোককে কথা শুনাতে পারতাম না, আর আজ ঘরে বসে চাবি ঘুরিয়েই হাজার হাজার মাইল দূরের কথাও শুনতে পারি। বিজ্ঞানের আবিষ্কারে সমগ্র মানব-সমাজের রূপটি যেন বদলে যাচ্ছে, সাথে সাথে আধ্যাত্মিক রাজ্য সম্বন্ধেও মানুষ ধীরে ধীরে অবিশ্বাসী হয়ে পড়ছে। ঈশ্বর, ভগবান, আত্মা, পরমাত্মা, পরকাল এমন কি ধর্ম, নীতি, দুর্নীতি, সুনীতি— এসব সম্পর্কেও মানুষের বিশ্বাস যেন ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। নীতি আবার কি? সদাচার আবার কি? এমন কি morality বলেও যেন মানুষের কিছু নেই। এক কথায়— যাতে যার সুখ লাগে, সে তাই করে যাচ্ছে। কোন কোন দেশ সগর্বে ঘোষণাই করেছে যে ঈশ্বর বলে কিছু নেই, ঈশ্বরের কোন প্রয়োজনও মানুষের নেই। ধর্ম কথা, শাস্ত্র কথা— এসব তাদের ভাষায় যেন আফিং— opium অর্থাৎ মানুষকে ফাঁকি দিয়ে নিশ্চেষ্ট করে রাখবার একটা ব্যবস্থা। বিজ্ঞানের প্রসারতার সাথে সাথেই যে এ ধারণাটা এসেছে, এটা নিশ্চয়ই আপনারা স্বীকার করবেন। দিনের পর দিন যে ধর্ম, আত্মা, ভগবান ইত্যাদি বিষয়ে মানুষের আগ্রহ, শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস ক্ষীণ থেকে ক্রমে ক্ষীণতর হয়ে আসছে এটা নিশ্চয়ই সবাই লক্ষ্য করেছেন। কাজেই এ সম্বন্ধে একটা স্পষ্টাস্পষ্টি বোঝাপড়া করা দরকার। যদি স্থির হয় যে ধর্মীয় কথার আর এখন প্রয়োজন নেই, ঈশ্বর বা ভগবান বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই, তা'হলে আর দেরি না করে এ পথ ছেড়ে দেওয়াই মঙ্গল। আর যদি একটা কিছু থেকেই থাকে, তা'হলে সে বিরাট বস্তু সম্পর্কে অস্বীকৃতি এবং অশ্রদ্ধা সমগ্র মানবজাতির পক্ষে ঘোরতর অশান্তির কারণ হয়ে উঠবে, তাতে কোন সংশয় নেই।

যে বিশ্লেষণটুকু করলাম, তাতে এই দাঁড়াল যে, দেহের জন্য যেমন খাদ্য অনুসন্ধানের চেষ্টা আছে, তেমনি আত্মার অনুসন্ধান, আত্মার আস্বাদ্যবস্তুর অনুসন্ধান, তাঁকে জানবার এবং পাবার চেষ্টাও সাথে সাথে দরকার। দেহের এবং আত্মার উভয়ের প্রয়োজনের তাগিদ আমাদের কাছে সমান নয়। আমরা বলি— এ কারণেই যত অনর্থ, যত অশান্তি! আত্মা অভুক্ত, দেহ প্রচুর পরিমাণে প্রয়োজনের অতিরিক্ত গ্রহণ করছে। মানুষের যতটুকু দরকার, তার চেয়ে production হচ্ছে অনেক বেশি। অথচ পাশাপাশি দারিদ্র্যও আছে অনেক । আত্মা একেবারেই অভুক্ত। কাজেই খুঁজে দেখার দরকার বৈজ্ঞানিক যুগ আর তার পাশে মোটা কথায় ঈশ্বর— এ দুয়ের সাথে কি সম্পর্ক। যদি বলেন, বিজ্ঞানের যুগে ঈশ্বর অচল, ঈশ্বরের কোন প্রয়োজন নেই; উত্তরে, আমরা বলব— বিষয়টি একটু গভীরভাবে আলোচনা প্রয়োজন। এ আলোচনাটি হওয়া উচিত যুবকদের কাছে। বৃদ্ধ যাঁরা pension-holders, জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন, তাঁদের জীবনটা ত একপ্রকার কেটে গেছে। যারা সমাজের ভার বইতে কেবলমাত্র অগ্রসর হচ্ছে, সমাজের শ্রেষ্ঠ স্থানগুলি যারা ৫/১০ বছরের মধ্যে দখল করবে, তারাই হল যুবক। তাদের এ সম্বন্ধে একটা খুব পরিষ্কার ধারণা থাকা সঙ্গত। বিজ্ঞানের যুগে ঈশ্বরকে রাখা যায় কি না? ঈশ্বরকে আমাদের কোনো প্রয়োজন আছে কি না? প্রশ্নগুলি একটু গভীরভাবে তলিয়ে দেখা দরকার। এজন্য যুব-সমাজের কাছে বিজ্ঞান ও ধর্ম সম্বন্ধেই আলোচনা করতে বসেছি; আমার মনে হয়, বর্তমান সময়ে যুব-সমাজের কাছে বলবার কথা এটাই সবচেয়ে বেশি জরুরি।

বিজ্ঞান আর ঈশ্বর। প্রথমে, যাঁরা বিজ্ঞানের পক্ষে আছেন, তাঁরা ঈশ্বর স্বীকার করেন না এটাই ধরে নিলাম। কাজেই তাঁদের পক্ষের যুক্তিগুলি আগে স্থাপন করি। তারপর সেগুলি খণ্ডন করার সুযোগ হলে করব, আর না পারি তাঁদের কথাই মেনে নেব। বিজ্ঞান আবিষ্কার করছে কতগুলি law। Laws of nature- নিয়েই বিজ্ঞানের আরম্ভ। বিজ্ঞান বলতে এখন আমরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকেই বুঝব। অতি প্রাচীনকালেও আমাদের দেশে বিজ্ঞান ছিল, কিন্তু সে বিতর্কে প্রবেশ করব না। Newton, Gallelio থেকে যে বিজ্ঞান শুরু হয়েছে তাকে লক্ষ্য করেই বিজ্ঞান শব্দটি প্রয়োগ করছি। Newton, Gallelio -এর laws of nature থেকেই মোটামুটি বর্তমান বিজ্ঞানের সূচনা। Newton- কে অনুসরণ করে আজ পর্যন্ত প্রকৃতির বহু রহস্য মানুষের নিকট উদ্ঘাটিত হয়েছে, বহু অভিনব প্রাকৃতিক শক্তি এবং প্রাকৃতিক কর্মের কৌশল মানুষ জানতে পেরেছে। প্রকৃতির গোপন প্রকোষ্ঠে যে সব অতি সূক্ষ্ম কাজ চলছে, সেগুলোকে মানুষ আজ প্রকাশ্যে নিয়ে এসেছে। এভাবে বিজ্ঞান দিনের পর দিন উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে।

বিজ্ঞানের মোটামুটি দুটি ভাগ— pure science বা শুদ্ধ বিজ্ঞান এবং অপরটি applied science অর্থাৎ কার্যে প্রযুক্ত বিজ্ঞান। শুদ্ধ বিজ্ঞান কেবল সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করে; তারপর অপর দলটি সে সব বৈজ্ঞানিক সত্যকে মানুষের উপযোগী করে কাজে লাগায়। কাজে লাগানোটা কিন্তু বিজ্ঞান নয়— এটা মানুষে করে। ভাল লোক হলে ভাল কাজ করে আর মন্দ লোক হলে মন্দ কাজে লাগায়। অনেক সময়ই আমরা এ শুদ্ধ বিজ্ঞানটাকে ভুল বুঝি। জীবনে যেটা প্রযুক্ত হয় তাকেই বিজ্ঞান বলে ভুল করি। বিজ্ঞানকে যারা মানুষের কাজে ব্যবহার করে তাদের ভাল বুদ্ধি, কল্যাণ বুদ্ধি থাকলে মানুষের কল্যাণে লাগায়, আর মন্দ বুদ্ধি, অকল্যাণ বুদ্ধি থাকলে মানুষের অমঙ্গল সাধন করে। যেমন, Atomic energy দিয়ে পৃথিবীর প্রভূত কল্যাণ করা যায়, আবার হিরোসিয়াম যা করেছে আমেরিকানরা, তা-ও করা যায়। এ ধরনের ধ্বংসাত্মক কাজের জন্য বিজ্ঞানকে দায়ী করা সঙ্গত নয়। শুদ্ধ বিজ্ঞানের বক্তব্যই আগে বলব, প্রয়োগের কথা পরে প্রসঙ্গ এলে বলব।

পূর্বে বলেছি বিজ্ঞান শুধু সত্য আবিষ্কারের চেষ্টা করে। তার কথা হল— প্রকৃতির মধ্যে সর্বত্রই একটা Uniformity আছে। অর্থাৎ সবাই একটি নিয়ম মেনে চলে। Physics, Chemistry, Biology ইত্যাদির যে সমস্ত Laws আবিষ্কৃত হয়েছে তা সকল সময় সর্বত্র সমানভাবে প্রযুক্ত হবে। যদি কোথাও সামান্য ব্যতিক্রম দেখা যায় তবে বিজ্ঞান আবার গভীরভাবে গবেষণা চালিয়ে নূতন একটা Law আবিষ্কার করে বলবে—এটা আমাদের জানা ছিল না, এখন জেনেছি। কোনো exception মানতে রাজি নয়। তারা বলবে— হয়ত সূক্ষ্মতর আরও কোনো law আছে, যা আমরা এখনও জানতে পারিনি। কাজেই প্রকৃতির বিধান অনুসারেই এ বিশ্বসংসার চলছে। এর বাইরে কিছু নেই unnatural, supernatural অর্থাৎ অপ্রাকৃত, অতিপ্রাকৃত বলে কোনো কিছু থাকতে পারে না। আগে লোকে বলত এটা unnatural, ওটা supernatural. কিন্তু বিজ্ঞান এখন প্রকৃতির বাইরে কিছুই স্বীকার করতে রাজি নন। মানুষ যে ঐ ধরনের একটা কিছু বলত, সেটা সম্পূর্ণ অজ্ঞতা প্রসূত। পণ্ডিত নেহেরু তাঁর মেয়ের কাছে চিঠি লিখেছেন— Letters from a Fahter to his daughter'। এই বইখানা আপনারা অনেকেই পড়েছেন। বইখানা এককালে পাঠ্য তালিকায় স্থান পেয়েছিল। বইতে তিনি লিখেছেন— ধর্মের জন্ম হয়েছে from ignorance and fear, অর্থাৎ নিছক অজ্ঞতা এবং ভীতিই ধর্মের জন্মদাতা।

কথাটির তাৎপর্য হল— primitive অর্থাৎ আগের কালের লোক অজ্ঞ ছিল। তারা প্রকৃতির রহস্য জানত না, তাই তারা ধর্ম, ঈশ্বর, পরকাল ইত্যাদি মেনে চলত। যেমন, হঠাৎ মেঘ গর্জন করে উঠল, তারা বুঝতে পারত না কি করে এই শব্দ হল। তাই তারা ভাবত—ইন্দ্র নামে যে একটা দেবতা আছে, সে ক্রুদ্ধ হয়েছে। অথবা রুদ্র নামে যে দেবতা আছে তাকে খুশি করতে হবে ইত্যাদি। কলেরা লাগলে তারা মনে করত "মা কালী" রাগ করেছেন, সুতরাং মা কালীর পুজো দাও, তা হলেই সেরে যাবে। এখন আমরা জানি কেন মেঘ গর্জন হয়, সূর্যগ্রহণ হয় কেন, কলেরা হয় bacilli থেকে, মা কালী রাগ করেন না ইত্যাদি—এসব রহস্য বিজ্ঞান আমাদের শিখিয়েছে। সুতরাং আগে যে মানুষ অজ্ঞতা হেতু ঈশ্বর ভাবত, সে ভাবনার এখন আর প্রয়োজন নেই। এখন বিজ্ঞানের দৌলতে বিশ্বের সমস্ত রহস্য আমরা জানি আর যা জানি না, তাও বিজ্ঞানের পথেই জানব। মা কালীর পূজা দেবার কোনো প্রয়োজন নেই। পণ্ডিতজীও তাই বিশ্বাস করেন না যে ঈশ্বর বলে একটা কিছু আছে। কিন্তু আমরা মনে করি—ঈশ্বর বিশ্বাস না করলেও এটুকু বিশ্বাস করা উচিত ছিল যে তাঁর দেশের কোটি কোটি মানুষ আজও ঈশ্বরকে মানে। যাদের আমরা জড়বাদী বলি, ঘোর বস্তুবাদী বলি, তাদের রাষ্ট্রের কর্ণধারগণও এত প্রকাশ্যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করেন না। কোথা থেকে এসে কোথায় গেলাম; অজ্ঞতা এবং ভীতি থেকেই যে ধর্মের জন্ম তার দৃষ্টান্ত দেখাতে গিয়ে এ-কথাগুলো বলতে হল। আমরা অজ্ঞ ছিলাম বলেই মনে করতাম, প্রকৃতির অতীত কিছু আছে; এ-কথা প্রসঙ্গেই একটা Side issue-তে চলে গেছি, আবার ঘুরে আসি আমাদের কথায়।

বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছেন যে, প্রকৃতির মধ্যেই সব। প্রকৃতির সীমার বাইরে অতিপ্রাকৃত বা অ-প্রাকৃত যে কিছু থাকতে পারে, বিজ্ঞান একথা মানে না। কারণ তার গবেষণাগারে তেমন কিছু ধরা পড়ে নি। আমাদের শাস্ত্রকারেরাও আত্মা, ঈশ্বর, ভগবান, পরমাত্মা, পরলোক, স্বর্গ ইত্যাদিকে বিচারের মধ্যে কখনও আনতে চান নি। তাঁদের কথা হল— লৌকিক বিচারে এসবের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে না। প্রকৃতির অতীত যে, সে অচিন্তিত, তাকে চিন্তা দিয়ে ধরা যায় না, যেখানে বুদ্ধিরও প্রবেশের অধিকার নেই। আর বিজ্ঞানের মত হল যে, যেখানে বিজ্ঞানের গবেষণা প্রবেশ করে না, তা মিথ্যা, তার কোন অস্তিত্ব নেই। এমন কোনো কিছু থাকতেই পারে না, যার রহস্য উদ্‌ঘাটনে বিজ্ঞান অক্ষম। তুমি যদি বল নিশ্চয়ই তেমন কিছু আছে আমি বলব— আমার ল্যাবরেটরিতে পাওয়া যাচ্ছে না। Test-tube হল কোনো জিনিসের রহস্য উদ্‌ঘাটনের একটি মূল্যবান অস্ত্র। তার ভিতর যাকে প্রবেশ করান যায় তাকেই আমরা সত্য বলে মানি। যাকে ল্যাবরেটরিতে নিয়ে Test-tube-এ ঢুকান যায় না, সে জিনিস সম্পর্কে আমাদের কোনো আস্তা নেই। অর্থাৎ, অপ্রাকৃত বলে যা আপনারা বলছেন, তার কোনো অস্তিত্বই নেই। কথাটা খুব মোটা করেই বললাম। বিস্তারিতভাবে আলাদা আলাদা করেও বলা যায়। সমস্ত Science যদি সত্য হয়, তা'হলে ঈশ্বর বলে কিছু নেই। আর থাকলেও আমাদের কোনো কাজে লাগে না। আমরা প্রাকৃত জীব, প্রকৃতির মধ্যে আছি আমরা এবং আমাদের সমগ্র জীবনটা প্রকৃতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত। যা কিছু ঘটে, সবই প্রাকৃত। অপ্রাকৃত বলে যদি কিছু একটা থেকেই থাকে, তা'হলেও প্রকৃতির মধ্যে যে সে intervene অর্থাৎ হাত ঢুকাতে পারে, এটা কিছুতেই সম্ভব নয়— এ হল মোটামুটি বিজ্ঞানের পক্ষের কথা।

যাদের কথা আলোচনা করব, তাদের কথাটা আগে বুঝে নেওয়া দরকার। আমি যার কথা খণ্ডন করতে বসেছি, তার কথাটা কি? সে যে ঈশ্বর মানে না, তার মূল যুক্তি হচ্ছে— যেখানে যা কিছু ঘটছে, সবই প্রাকৃত, এই প্রকৃতির সীমার বাইরে কিছু নেই। ধরুন, আপনি একটা বিপদে পড়েছেন— আপনার ছেলে অসুস্থ— ডাক্তারও ঔষধ দিচ্ছে, আর আপনিও ঈশ্বরের কাছে নিরাময়ের জন্য প্রার্থনা করছেন। ছেলে ভাল হয়ে গেল, আপনি বলবেন— যাক্ ঈশ্বরের দয়ায় সেরে গেছে। একথা বিজ্ঞান মানে না, কারণ ঈশ্বর বলে যে আলাদা একটা factor, প্রকৃতির ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার তার নেই। অসুখটা হয়েছে সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক কারণে, তার মধ্যে ঈশ্বর এসে হাত ঢুকিয়ে দিলেন, এটা হতে পারে না। প্রকৃতির ভিতর প্রবেশ করার তার অধিকার নেই। প্রকৃতির অতীত কোনো কিছু আমরা স্বীকার করি না, যেহেতু আমাদের ল্যাবরেটরিতে তাকে ধরা যায় না। মোটামুটি এ হল বিজ্ঞানের কথা। একথাটি ধরেই আমরা আলোচনায় অগ্রসর হব।

বিজ্ঞানগর্বীরা বলেন, ধর্মীয় বিষয় যা কিছু আছে, সবই নিতান্ত অপ্রয়োজনীয়। ঈশ্বরের কোনো প্রয়োজন নেই। আরও একটা কথা তাঁরা বলেন, ঈশ্বর-বিশ্বাসীরা তাঁদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যই ঈশ্বরকে এনে বসিয়েছেন। সমাজের মধ্যে একদল লোক ধনী, অপর দল দরিদ্র। ধনী চেষ্টা করেছে কি করে দরিদ্রকে চিরকাল দরিদ্র রাখা যায়। তাই দরিদ্রকে সে বুঝিয়েছে পূর্বজন্মে তুমি পাপ করেছ— সে পাপের ফলেই তুমি দরিদ্র হয়েছ। ভগবান যে অবস্থায় রাখেন সে অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়। এভাবে বুঝানকেই আফিং খাওয়ান বলে। capitalist-রা labour-দের বুঝায় পরিশ্রম করে খাবার যোগাড় কর। "Blessed are the poor. They shall see God." প্রকারান্তরে একথাই বলা হচ্ছে যে, দরিদ্র তুমি দরিদ্রই থাক, আমি তোমাকে utilise করে বড় হতে থাকি; তুমি বাইবেলের Blessed are....ইত্যাদি মন্ত্র মুখস্থ করতে করতে দরিদ্র হয়েই থাক। এভাবে ঈশ্বর-বিশ্বাসকে প্রয়োগ করে ধনী তার কার্যোদ্ধার করে নিচ্ছে। অতএব, শুধু ভীতি এবং অজ্ঞতা থেকেই ধর্মের জন্ম হয়নি। মানুষ মানুষের উপর আধিপত্য বজায় রাখার উদ্দেশ্যেই ধর্ম জিনিসটাকে আমদানি করেছে।

ব্রাহ্মণ তাঁর ঈশ্বর-বুদ্ধির সাহায্যেই তাঁর status-কে maintain করে চলেছেন। পতিত এসে পণ্ডিতকে শুধাল, পণ্ডিত মশাই! এত দুঃখ পাচ্ছি কেন? পণ্ডিত মশাই বলে দিলেন— 'তুই দুঃখ পাবি না? পূর্বজন্মে কত পাপ করেছিস— তা ত তুই জানিস না'। এ পাপ যাবে কি হলে? "আমাদের ভেট দে, পুজো দে, তা'হলে এজন্মে হয়ত কিছু হবে না, কিন্তু পরজন্মে স্বর্গে তোর জন্য একটা seat reserve করে রাখব।" মোট কথা ধর্ম, ঈশ্বর, পরকাল এসব কথা বলে যে, সে হীন পতিতকে দাবিয়ে রাখছে। কাজেই এখন এসব ধর্ম বিশ্বাসকে যত তাড়াতাড়ি আমরা উড়িয়ে দিতে পারি, তলায় যারা আছে তারা তত তাড়াতাড়ি মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে এবং ধীরে ধীরে মানুষের ভিতরের মিথ্যার অন্ধকারটা কেটে যাবে। অতএব, ঈশ্বর-বিশ্বাস যে আমাদের প্রচুর ক্ষতি করছে একথাটা বিশেষ করে প্রচার করা দরকার।

প্রথম যুক্তিটা হল Physical Science-এর, দ্বিতীয়টা Economic Science-এর। বিজ্ঞানের পক্ষে আর কোন যুক্তি এখন তুলব না, তা'হলে বক্তৃতা অনেক লম্বা হয়ে যাবে এবং অনেকেরই হয়ত ধৈর্যচ্যুতি ঘটবে। বিজ্ঞানের পক্ষে অর্থাৎ আমার বিরুদ্ধ পক্ষের কথা কিছু বললাম, এবার ঈশ্বর পক্ষের কথা কিছু বলব। বিরুদ্ধ পক্ষের যুক্তিটারই এখন কাটতি বেশি। তাদের মুখপাত্রও অনেক। তারা খুব উচ্চকণ্ঠে তাদের কথা সবাইকে শুনিয়ে যাচ্ছে। ঈশ্বরের পক্ষে কথা খুব দুর্বল। কোনো ভাল organ তাদের নেই। তাদের কথা শুনতে কেউ চায় না। এও একটা কম বিপদ নয় যে, বিরুদ্ধ পক্ষের প্রচার বিভাগ খুব জোরালো আর ঈশ্বরের পক্ষে প্রচার বিভাগ তেমন জোরালো না, তাদের কণ্ঠ দুর্বল, ক্ষীণ। কিন্তু এ পক্ষের কথাও কিছু শুনা দরকার। শুধু এক পক্ষের কথা শুনেই আজ আমরা এভাবে বিপদাপন্ন। এবারে বিরুদ্ধ পক্ষের কথার উত্তর দেবার চেষ্টা করব।

বিজ্ঞান একথা বলছে যে, সব কিছু প্রকৃতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত এবং প্রকৃতির ওধারে কিছু নেই। আমাদের প্রথম আপত্তি হল— এ 'নাই' কথাটা আপনি একটু সাবধানে বলবেন। আপনার বিজ্ঞানে যা আছে, সে কথাই শুধু আপনি বলতে পারেন। যা নেই তার কথা বলার অধিকারও আপনার নেই। বিজ্ঞান সত্য আবিষ্কার করে। ঠিক সত্য আবিষ্কার করে না। সত্য বলতে যাকে বলা হয় absolute truth অর্থাৎ চরম সত্য, সেটা বিজ্ঞান আবিষ্কার করে না এবং দাবিও বিজ্ঞান করে না। কিন্তু আমরা যারা বিজ্ঞানবিদ না হয়েও বিজ্ঞানের দোহাই দিই, আমরা না বুঝেই ওসব কথা বলি। বিজ্ঞানবিদরা সব সময়েই বলেন, আমাদের সবই hypothesis। বিজ্ঞান প্রথমে একটা কিছু ঠিক করে নেয়, তারপর তার পেছনে experiment চালিয়ে যদি দেখে যে, না এটা ঠিক নয়, তবে সেটাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করে। আবার একটা সত্যকে ধরে নেয়—সেটার পেছনে experiment চালায় এবং যদি দেখে যে, না এটা ঠিক নয়, তবে সেটাকে তৎক্ষণাৎ ত্যাগ করতেও দ্বিধা করে না। সেজন্যই ত, তারা যে সত্যকে ধরে নেয় সেটা hypothesis, hypothesis হল— একটা সত্যকে সামনে নিয়ে দাঁড়ানো। এটাকে আপাতত সত্য বলে ধরে নিয়েই অগ্রসর হচ্ছি। যদি না প্রমাণিত হয়, তাহলে পরিত্যাগ করব এবং এভাবে পরিত্যাগ করাটা বিজ্ঞানের অগৌরব নয়, বরং গৌরব। আমরা এতকাল যেটাকে সত্য বলে ধরে নিয়েছিলাম, সেটা ঠিক নয়, এবারে আর একটা কারণ বের হয়ে পড়ল। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস যদি এভাবে সে তার প্রাপ্ত সত্যকে ছেড়ে দিয়ে আর একটা সত্যকে ধরতে পারে, সেটা তার পক্ষে অক্ষমতা নয়। বরং সেটাই তার পক্ষে জীবনের প্রমাণ। যে সত্যকে এতকাল সে আঁকড়ে ধরে বসে ছিল, সেটাকে ছেড়ে দিতে তার কোনো দ্বিধা নেই। নূতন একটা Theory বেরিয়ে পড়েছে, কাজেই পূর্বের Theory-কে সে ত্যাগ করে দিল। এ ভূমিতেই বিজ্ঞান এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু আমরা যাকে সত্য বলি, তার কোনো কালেই কোনো পরিবর্তন হয় না। এ ধরনের কোনো সত্য বিজ্ঞান দাবিও করে না এবং তার কোন খোঁজ বিজ্ঞান দিতেও পারে না। সুতরাং প্রকৃতির অতীত কিছুই নেই— একথা বলবার অধিকার বিজ্ঞানের নেই। যে পর্যন্ত আমার গবেষণা পৌঁছাল, সেটুকুই আছে। এর বাইরে আর কিছু নেই— একথা বিজ্ঞান বলতে পারে কি? বাইরের কথা না-ই বললাম, প্রকৃতির মধ্যেই কত কিছু আজও অনাবিষ্কৃত রয়েছে। যেমন, চক্ষু দেখে। চক্ষু যা দেখে আমরা তাকে প্রত্যক্ষ বলি এবং খুব বড় প্রমাণ বলেই মনে করি। কিন্তু চক্ষু কতটুকু দেখে? চক্ষু মাত্র ৭টি রঙই দেখতে পায়। Violet-এর চেয়ে বেশি Vibration কিংবা Red-এর চেয়ে কম vibration হলে সে দেখে না। লাল বর্ণের নীচে এবং বেগুনি বর্ণের উপরে আরও শত শত বর্ণ থাকতে পারে। আমরা তা চক্ষু দ্বারা দেখতে পাই না। ultraviolet আর Infrared আমাদের কাছে অন্ধকার। কান শব্দ শুনে। কিন্তু এমন শত শত vibrations আছে আমাদের কানের membrane-কে আঘাত করার যার কোন ক্ষমতা নেই। এভাবে প্রকৃতির যে field-টা নিয়ে বিজ্ঞান গবেষণা চালাচ্ছে, তার মধ্যেই এরূপ শত

শত অজানা জিনিস রয়েছে। অতএব, এর বাইরে কিছু নেই, —সেকথা বিজ্ঞান বলে কোন্ সাহসে? Pure Science একথা বলে না। তাকে যারা apply করে, তারা স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যেই একথা প্রচার করে।

Element আবিষ্কার করতে গিয়ে এক এক করে ১০৩ টিতে এসে হাজির হয়েছে। এরপর ১০৪ টিতে দাঁড়াবে না বিজ্ঞান জোর করে একথা বলতে চায় না। তারা যে পর্যন্ত খুঁজে পেয়েছে, তার কথাই বলছে। তা'ছাড়া "হ্যাঁ" বলা যত সহজ "না" বলা তত সহজ নয়। কেউ এ সভায় এসে জিজ্ঞেস করলেন—যোগেন বাবু বলে কোন লোক এখানে আছে? যোগেন বাবুকে আমি দেখেছি। বলে দিলাম "হ্যাঁ" যোগেন বাবু এখানে আছে। আর যদি আমাকে "না" বলতে হত, তা'হলে এই দু'হাজার লোকের প্রত্যেককে জিজ্ঞেস করতে হত— "হ্যাঁ মশাই আপনার নাম কি যোগেন্দ্র?" "আপনার নাম কি যোগেন্দ্র?" এভাবে সবাইকে জিজ্ঞেস করে এসেও সঠিক উত্তর দেওয়া যেত না, কেন না আমি যাদের জিজ্ঞেস করে এসেছি ইতিমধ্যে যদি তাদের মধ্যে আর কেউ এসে বসে থাকে তাহলেই মুস্কিল। কাজেই, "নেই"— একথাটা বলা খুব কঠিন। এ স্থানটিতে একটি সূচ পড়ে নেই —একথা সহজে বলা যায় না। কিন্তু যে দেখছে সত্যি একটি সূচ পড়ে আছে, সে জোর করে বলতে পারে, হ্যাঁ, এইত সূচ। যদি আমার Experiment-এর মধ্যে এল, তবে বলি আছে। আর নাই বলাটার কোন যুক্তি নাই। "নাই" কথাটা যে বলবেন তার পক্ষে logical কোনো middle term পাবেন কোথায়? না বলতে কোন কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক করা যাবে না অতএব কোন সিলোজিসম টানা যাবে না। প্রকৃতির মধ্যেই আমরা আছি, প্রকৃতির রহস্যই আমরা খোঁজ করছি। সুতরাং যদি আমরা বলি, প্রকৃতির ওধারে কিছু নেই তাহলে বিদেশী ভাষায় সেটাকে audacity বললে অন্যায় হবে কি? প্রকৃতির বাইরে কিছু নেই, আমরা সব জেনে ফেলেছি, একথাটা বলা অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার কার্য নয় কি? সাধারণত ঈশ্বরকে বলি আমরা সৃষ্টিকর্তা। বিজ্ঞান বলে ঈশ্বরের ত দরকার নেই—প্রকৃতিই সৃষ্টি করেছে।

প্রত্যেক ঘটনারই একটা কারণ আছে আবার তারও কারণ আছে, তারও কারণ আছে। পরমাণু থেকে, Electromagnetic Energy থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং এর পেছনে আর কারো প্রয়োজন নেই। মানুষ সৃষ্টির যে উপাদান, তাকে বিশ্লেষণ করলে আর একটি উপাদান পাওয়া যায়, তাকে বিশ্লেষণ করলে আবার আর একটি— এভাবে বিশ্লেষণ করে করে শেষ উপাদানটি পেয়ে যদি মানুষ জিজ্ঞেস করে, এটা কোত্থেকে এল? উত্তরে বিজ্ঞান বলবে, এটা আছে। অমনি অমনি আছে? হ্যাঁ আছে। অমনি অমনি থাকা ত খুব কঠিন কথা। তা'হলে আমাদের শাস্ত্রের ভাষায় বলতে হয় স্বয়ম্ভু। সুতরাং স্বয়ম্ভু নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করেছেন। একথা স্বীকার করলেই ত আপনি ঈশ্বরতত্ত্বে পৌঁছে গেলেন। যদি শুধু বলেন, আছে এবং আছে সে চরম বস্তুরূপে। কিন্তু আপনি যে তার তলায় অনুসন্ধান করতে রাজি হন না! যদি অনুসন্ধানই না করেন, তবে বলতে পারেন— মশাই জানি না। চরম বস্তুগুলি কোত্থেকে এসেছে, পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে না সুতরাং একজন স্রষ্টা নেই— একথা বলার অধিকার আপনার নেই। চরম বস্তুগুলি আছে। যেমন শতাধিক element আছে। এগুলি কোত্থেকে এল? এগুলি নিত্য। কেউ সৃষ্টি করে নি, কোন নিয়ন্তা নেই। একথা জোর করে বলা যায় কি? বিজ্ঞানের আবিষ্কার যতই এগিয়ে যাচ্ছে, ততই দেখা যাচ্ছে যে শেষ পর্যন্ত সব কিছু যেন Energy-তেই পর্যবসিত হচ্ছে। অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত যেন এক তত্ত্বেই পৌঁছে যাচ্ছে। এখন এই সারতত্ত্ব Energy-টা কি রকম, তা নিয়ে বৈজ্ঞানিকরা মাথা ঘামাচ্ছেন।

আগে ছিল পরমাণুই চরম। ক্রমে পরমাণু ভেঙ্গে Electron, Proton ইত্যাদি বেরিয়েছে এবং আরও ভিতরে গেলে দেখা যায় কেবল একটা Energy, এই Energy-র রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে বিজ্ঞান একটু ধাঁধায় পড়েছে। এতকাল Physics-এ Law of Determinism চালু ছিল। এখন Law of Indererminism (অর্থাৎ অনির্ণেয়) আসরে এসে হাজির হয়েছে। একটা Atom-এর মধ্যে যে একটা Electron, Nucleus-এর চারিদিকে কক্ষপথে ঘুরছে, সেটা যেন অনেকটা সৌরজগতের মত। Electron-এর সংখ্যা বিভিন্ন Element-এ বিভিন্নরূপ, সেটা নির্ভর করে Atomic number-এর উপর; যেমন Hydrogen-এর Atom-এ মাত্র একটা Electron আছে। সৌরজগতের গ্রহগুলি যে সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে, তারা তাদের কক্ষপথ পরিবর্তন করে না। কিন্তু Electron-গুলি ঘন ঘন তাদের কক্ষপথ পরিবর্তন করছে। একটা পথ থেকে যেন অপর পথে jump করে চলে যাচ্ছে। কিন্তু কখন এরা Jump করবে এবং কখন কত velocity-তে jump করবে, পূর্ব হতেই অঙ্ক কষে তার কোন ভবিষ্যদ্উক্তি আজও করা সম্ভব হয়নি। যদিও এ নিয়ে গভীর গবেষণা চলছে, খ্যাতনামা অনেক বৈজ্ঞানিক বলেছেন, এটা নাকি সম্ভব নয়, কারণ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র যে Electron, তার মধ্যে বোধ হয় একটা চেতনা আছে, একটা consiousness আছে। এজন্যই velocity-টা কত হবে আগে থেকে হিসাব করা যাচ্ছে না।

একটা Group সম্বন্ধে অবশ্য একথা খাটে না। এই যে এক হাজার লোকের একটি দল আছে এরা কখন উঠে যাবে মোটামুটি বলা যায়। কিন্তু আমি সঙ্গে সঙ্গে উঠব কিনা আপনি তা বলতে পারেন না। আমি ইচ্ছা করলে হয়ত কিছুক্ষণ বসেও থাকতে পারি। একটা ব্যক্তি সম্বন্ধে ভবিষ্যদুক্তি করা কঠিন, একটা Group সম্বন্ধে করা যেতে পারে। যেমন একটা Insurance company পূর্ব হতেই Budget করে নেয় যে, এবছর এতগুলি লোক মারা যাবে, অতএব এত টাকা company-কে দিতে হবে। কার্যত দেখা যায়, মৃত্যুর হার তাদের গণনার কাছাকাছিই আছে, বেশি তফাত হয় নি। কিন্তু যদি তাদের জিজ্ঞেস করেন— সুরেশবাবু এবছর মারা যাবে কি না? তাদের company তা বলতে পারবে না। ব্যক্তি কিনা, তার স্বাধীনতা আছে। তাই সঠিক করে বলা যায় না। ধরুন ১০ টি পয়সা নিয়ে আপনি ছুঁড়ে দিলেন— কয়টি রাজার মাথা, কয়টি লতার উপরে থাকবে আন্দাজে প্রায় কাছাকাছি বলা যায়, একটি পয়সা ছুঁড়ে দিলে সঠিক বলা কঠিন।

বিজ্ঞানও যখন Element-কে ভাঙতে ভাঙতে শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁছেছে, তখন তার সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করতে পারছে না। এর

নাম Indetermination. Energy-টার যেন খানিকটা চেতনা আছে, অর্থাৎ চৈতন্যযুক্ত Energy. চেতনা বিশিষ্ট Energy স্বীকারও যা, ঈশ্বরত্ব স্বীকার করাও তা। অর্থাৎ তাহলে প্রকারান্তরে ঈশ্বরকে মানা হয়ে পড়ে। যা দেবী সর্ব্বভূতেষু শক্তিরূপেণ সংস্থিতা" "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে।" চণ্ডী একথাই বলেছেন যে, একটি মহাশক্তি আছে, যা চৈতন্যময়ী। অতএব, বিজ্ঞান চৈতন্যময়ী শক্তির প্রায় কাছাকাছি এসে পড়েছে।

খুব বড় একজন নামজাদা বৈজ্ঞানিক Arthur Eddington "Nature of the Physical Universe" নামে একখানা বই লিখেছেন। তাতে তিনি বলেছেন, ঐ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণিকাগুলি যেন মনে হয় mind-stuff অর্থাৎ আমাদের মন যা দিয়ে তৈরি, ঐগুলোও তা দিয়ে তৈরি। মনের উপর যেমন আমাদের কোন আধিপত্য নেই, কখন সে কি করবে, তার কোন স্থিরতা নেই, ঐ কণিকাগুলোও যেন ঠিক তদ্রূপ। অপর একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক Sir James Jeans "Universe Around Us" নামে একখানা সহজপাঠ্য বই লিখেছেন, Einstein-এর একখানা বই আছে "On God"—এই বইগুলো Populer ভাষায় লেখা। Sir James Jeans লিখেছেন—এ জগৎটা যে সৃষ্টি হয়েছে, এর পেছনে শুধু জড় পরমাণু একথা আমরা আগে বলতাম, এখন বলি না। কারণ আমরা আবিষ্কার করে করে এমন একটি অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছি যে, একথা এখন আর বলা চলে না। এমন একটা কিছু আছে এর পেছনে যার দ্বারা এই বৈচিত্র্যময় জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। শুধু জড় পরমাণু থেকে এটা সম্ভব নয়। এর দৃষ্টান্তটা তাঁরই ভাষায় "Mysterious Universe" বইতে লিখেছেন—শুধু জড়শক্তি থেকে এ জগৎটা সৃষ্টি হওয়া কত অসম্ভব তার দৃষ্টান্ত দিয়েছেন— "যদি একটা Type Machine-এর কাছে একটা বানর বসিয়ে দেওয়া যায় এবং বানর Type করতে থাকে, তাহলে ইংরেজির ২৬টি বর্ণমালা ঘুরে ঘুরে কাগজে উঠবে। এভাবে বানরের চেষ্টায় হয়ত কোন সময় একটি শেক্সপিয়ারিয়ান সনেটও লেখা হয়ে যেতে পারে। কারণ কবিতাও কতকগুলো অক্ষর সমষ্টি ছাড়া আর কিছু নয়। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ বছরের চেষ্টায় বানরের দ্বারা একটা কবিতা লেখা যদি সম্ভব হয়, তথাপি নিছক জড় শক্তি থেকে এ বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব নয়!"

"সৃষ্টির মূলে এমন একটি সত্তা আছে, যিনি প্রকাণ্ড একজন Mathematician নিশ্চই; তবে দয়াময়, কৃপাময় কি না জানি না। বিশ্বের কোথাও কোনও অঙ্কের ভুল নেই। অতএব, এর পেছনে একটি অঙ্কের brain আছে—এতে কোন সংশয় নেই।" আধুনিক কালের একজন শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের কথা বললাম। অঙ্ক জানা মানেই বুদ্ধি থাকা। এই বুদ্ধিবিশিষ্ট সমষ্টি চেতনাকেই এতকাল আমরা ঈশ্বর বলে আসছি। কোথাও একটা বিরাট জ্ঞানবিশিষ্ট চেতনা আছে। বিজ্ঞান এখন তারই border line-এ আছে। সুতরাং প্রকৃতির পরপারে কিছু নেই—একথা বলবার তার নিজের মুখ নেই। বৈজ্ঞানিকের মধ্যে যাঁরা চিন্তাশীল, তাঁরা ত বলেনই—"নাই" মানে আমাদের আওতার মধ্যে নাই। কাজেই, আমরা "নাই" বললে ঘাবড়াবেন না। আমরা এমন অনেক মূল্যবান জিনিসকেই নাই বলে থাকি, যেহেতু আমাদের হাতে বা কাজে তাদের পাই না। আমি যদি বলি মাতৃহৃদয়ে স্নেহ নেই, কি করে জানলেন? X-ray করে দেখেছি dissection করে দেখেছি, সমস্ত রক্তকণিকা বিশ্লেষণ করে দেখেছি, মাতৃস্নেহ বলে কোন বস্তু নেই। একথা শুনে মনে করবেন না মাতৃহৃদয় স্নেহশূন্য হয়েছে। মাতৃস্নেহ ঠিকই আছে, তবে আমাদের Laboratory তার আবিষ্কারের স্থান নয়। এখানে যেসব যন্ত্রপাতি আছে, সেগুলো স্নেহ নামক বস্তুটিকে ধরতে পারে না। কাজেই, আমরা "নাই" বললে আপনারা ভয় পেয়ে যাবেন না। নাই অর্থ আমাদের Laboratory-র মধ্যে নাই। যদি বলেন, মাতৃস্নেহ যে অত্যন্ত মূল্যবান জিনিস, বিজ্ঞান বলবে, যে জিনিস mathematical নয় যাকে আমরা কাজে লাগাতে পারি না, যাকে অঙ্কে আনতে পারি না, formula-য় ফেলতে পারি না, তা দিয়ে আমরা কি করব? যদি একই equation-এ স্নেহ বস্তুটিকে ফেলতে পারতাম, যদি স্নেহের একটা Calculus বের করতে পারি, তবে তাকে আমরা গ্রহণ করতে পারি।

অতএব বিজ্ঞানের কথা হল—আমরা কোনো চরম সত্য বের করি না। যখন আমরা কোনো কিছু "নাই" বলি, তখন আপনারা বুঝবেন যে সেটা আমাদের সীমার মধ্যে নাই। আপনি যদি অনুভব করে থাকেন, "আছে", তবে আছে বলতে পারেন। মাতৃস্তন্যে যদি ডাক্তার সিরিঞ্জ বসিয়ে দেয়, তবে সে পাবে খানিকটা রক্ত। দুধ সিরিঞ্জে আসবে না। সে বলতে পারে, মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ নেই। কিন্তু শিশু মুখ লাগিয়ে বলবে, আমি পেলাম, খেলাম। দুগ্ধ ত একটা জড়বস্তু—ঈশ্বর নয়। সেটা বের করার কৌশল আপনার যন্ত্রের নেই। শিশুর মুখে যে কি ব্যপার ঘটে, তা বিশ্লেষণ করে অনুরূপ ব্যাপার ঘটালেও আপনি দুধ পাবেন না। যে স্থান দিয়ে দুধ আসে, সে স্থানটি কাটলে দুধ আসে না কিন্তু শিশু মুখ লাগিয়ে দুধ বের করে আনে। একথা আমাদের শাস্ত্রে আছে—যঃ পশ্যতি স পশ্যতি। ঈশ্বরত্ব যে দেখে, সে বলে আছে, আছেই আছে। যে দেখে না, সে বলে, আমার যন্ত্রপাতির মধ্যে, হিসেবের মধ্যে পড়ল না। কাজেই নেই। সুতরাং জগতে প্রকৃতির অতীত কোন কিছু নেই— ঈশ্বর নেই—এসব বলার বিজ্ঞানের কোন অধিকার নেই। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধে বিজ্ঞান কোন সিদ্ধান্ত করতে পারে না। এ সম্বন্ধে মন্তব্য করার বিজ্ঞানের কোন অধিকারই নেই।

বিজ্ঞান কি করছে? বিশ্লেষণ করছে। মনে করুন, একটা সুরের বিশ্লেষণ করছে। বিশ্লেষণের চেহারাটি দেখুন—একটা গানের সুর সা-রে-গা-মা স্বরগ্রামের বৈচিত্র্য শুনছেন। বিজ্ঞান এসে বলবে—ও ত কতগুলো Vibrations শুনছেন। একটা সুর আর একটা সুরের তফাত শুধু Number of vibrations দিয়ে। বাতাসে সেকেন্ডে ২৫৬ স্পন্দন হলে 'সা' ২৮৮ হলে 'রে' ৩০০ হলে 'গা' ইত্যাদি। Per second কতগুলি Vibrations হচ্ছে, তার উপর নির্ভর করে— 'C' না 'D' না 'E'। বিজ্ঞানের হাতে গিয়ে গানটা দাঁড়াল কতকগুলো Vibrations-এর সমষ্টি। আপনি গান শুনছেন, আপনি Vibrations-এর খবর রাখেন না, আপনি গান উপভোগ করছেন। গানের আস্বাদন, আর Vibrations-এর অঙ্ক কি এক জিনিস?

বিজ্ঞান যদি বলে, গান বলতে ত কিছু নেই; শুধু Vibrations হচ্ছে, তাহলে কথাটা কেমন হল? গান জিনিসটা একটা কোয়ালিটি, আর Vibrations হল কোয়ানটিটি। একটা কোয়ালিটির মধ্যে একটা কোয়ানটিটি থাকতে পারে। কিন্তু কোয়ালিটিকে কোয়ানটিটি করে উড়িয়ে দেওয়াটা কেমন কথা?

ধরুন আপনি বর্ণালি উপভোগ করছেন— সুন্দর একটি রামধনু। বিজ্ঞান এসে বলবে ও কিছু নয়, VIBGYOR—ভায়লেট ইন্ডিগো ব্লু ইত্যাদি শুধু vibrations বৈচিত্র্য। এভাবে একটি চিত্রকরের চিত্রকেও আপনি শুধু vibrations বলে উড়িয়ে দিতে পারেন। Colour নির্ভর করে Retina-এর উপর সেকেন্ডে কতগুলো vibrations হচ্ছে, তার উপর। এভাবে সমস্ত quality-কে যদি আপনি quantity করেন তাতেও ক্ষতি নেই, কিন্তু আপনি যদি বলেন quality বলে কিছু নেই, তাহলে সেটা আপনার দুঃসাহসিকতা হল না কি? একথা আপনি বলবেন না। quantity গণনা করা আর কোয়ালিটি ভোগ করা এক জিনিস নয়। Retina-এর মধ্যে প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো vibrations হচ্ছে তা যে জানে না, সেও একখানা সুন্দর চিত্র আস্বাদন করতে পারে। অতএব, বলা যেতে পারে, বিজ্ঞানের যত বিশ্লেষণ সবই কোয়ালিটিকে কোয়ানটিটি করে দেখা। তাই, যদি সে বলে কোয়ালিটি বলে কোন কিছু নেই, তাহলেই আমাদের আপত্তি। কোয়ালিটি বলে কোন কিছু নেই—একথা বলাই চলে না। কোয়ালিটি না থাকলে এ জগৎটা চলছে কি করে? বিশ্বের বৈচিত্র্য ত কোয়ালিটি-তে। মহাত্মা গান্ধীজী আমার চেয়ে বড় সেটা কি কোয়ানটিটি-তে? গান্ধীজীর চেয়ে আমার গায়ের ওজন বেশি, ফ্যাট বেশি। তবে গান্ধীজী আমার চেয়ে বড় গুণে, সংখ্যায় নয়।

কোয়ানটিটি দিয়ে জগৎটার হিসেব করতে গিয়ে আমাদের কি দুর্দশা হয়েছে দেখুন—সর্বত্রই আজকাল শুনা যায়, Democracy। ধরুন, একটি শ্রেণিতে শিক্ষক একজন, কিন্তু ছাত্র অনেক। কোয়ানটিটি হিসেবে ত ছাত্র অনেক বেশি। এখন মাস্টারের কথাই ঠিক, না ছাত্রের কথাই ঠিক? ছাত্রের কথাই ঠিক, মাস্টারের পক্ষে ভোট কম। কাজেই নিছক সংখ্যা নিয়ে যদি জগৎটাকে ঢেকে দেন তাহলে বিরাট একটা সর্বনাশ হয়ে যাবে, মানবসমাজ কতকগুলো ইট-পাটকেলে পরিণত হবে। পুত্রের মাতা পুত্রের মুখ চুম্বন করলেন, আপনি বললেন, চুম্বন মানে বুঝলেন না! মায়ের গালে কতগুলো Muscle, আর ছেলের মুখের কতগুলো Muscle, এদের Movement হয়েছে মাত্র, একেই আপনারা চুম্বন বলেছেন। এ বিশ্লেষণ পুত্রের মুখ চুম্বন করে মাতার যে সুখানুভূতি জাগে বা পুত্রের যে সুখানুভূতি হয়, তা একেইবারেই বাদ পড়ে গেল না কি? আপনি vibrations দিয়ে হিসাব করে দিলেন চুম্বন মানে কতকগুলো muscles-এর vibration. কিন্তু Muscle-এর movement-টা আর চুম্বনের সুখ কি এক জিনিস? ঠিক তেমনি, জগতে ধর্ম, ঈশ্বর, সত্য, নীতি এগুলি কোয়ালিটি। একটা মানুষ ধার্মিক, এটা তার কোয়ালিটি, কোয়ানটিটি নয়। একটা মানুষ সত্যবাদী, বিনয়ী, নম্র; একটা মানুষ সাধু, ভক্ত; একটা মানুষকে আপনি অনায়াসে বিশ্বাস করতে পারেন—এসব হল মানুষের কোয়ালিটি। আমাদের ঈশ্বর হল একটা বিরাট কোয়ালিটি অর্থাৎ সমগ্র কল্যাণগুণের সমষ্টি। অতএব, যে ঈশ্বরকে আপনি উড়াবেন, সে ত কোয়ানটিটি নয়।

আপনার সংসারের মূল্যবান জিনিস কোনটাই কোয়ানটিটি নয়। আপনার পিতা-মাতার প্রতি যে শ্রদ্ধা, এটা কোয়ানটিটি নয়। কোয়ানটিটি শ্রদ্ধার বস্তু নয়। বিজ্ঞান বিশ্লেষণ করে বলে দিল, স্নেহের কিছু দেখতে পাচ্ছি না। পিতা-মাতাকে বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞান বলে দিল, ছেলেকে বিশ্লেষণ করে দেখেছি— এতে 90 billion of cells আছে, ভালোবাসার কিছু নেই। তাই বলে কি কোন মা-বাবা তাঁদের ছেলেকে ভালোবাসতে কসুর করবেন? ঠিক তেমনি বিজ্ঞান যদি বলে বিশ্বের সব বিশ্লেষণ করে দেখেছি—ঈশ্বর কোথাও নেই—সব কোয়ানটিটি, সব vibration। পূর্বে বলেছি এ ধরনের উক্তি 'audacity', 'ludicrous' আর এখন বলি, 'ridiculous'। সমস্ত জগৎটা আমরা বিশ্লেষণ করেছি, অঙ্কে নিয়ে গিয়েছি, formula-তে ফেলেছি, দেখেছি, ঈশ্বর নেই। অঙ্কের বাহিরে কিছু থাকতে পারে না। এ কথাটা বলা কি ঠিক? যে কথাটা বিজ্ঞান বলে না, সে কথাই প্রয়োগকারীরা উচ্চ রবে ঘোষণা করেছে। যারা বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে নানা অসাধ্য সাধন করছে, তারাই জোর দিয়ে বলছে— ঈশ্বর বলে কিছু নেই। এক কথায় সব কিছু quantity-তে নিয়ে গিয়ে বলছে, quality-নেই।

ঈশ্বরে বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা, এগুলি একটা বড় quality। ধর্ম বিশ্বাসটা জগতের প্রতি একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি। প্রসঙ্গক্রমে কথাটা না এলেও বলি— জগৎটাকে আপনিও দেখেছেন, আমিও দেখছি। যে অধার্মিক তার দৃষ্টি, আর যে ধার্মিক তার দৃষ্টি— এ দু'য়ের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য। একটি বিশেষ প্রকারের দেখা হল, ধর্মের দৃষ্টিতে দেখা। প্রত্যেক জিনিস দেখারই একটা আলাদা standpoint আছে। ধরুন, একখানা পুঁথি আপনি একজন দপ্তরির হাতে দিলেন। সে দেখে বলল, চমৎকার। এ চমৎকার অর্থ পুঁথির Bindingটি চমৎকার। Publisher-এর হাতে দিলেন; সে দেখে হয়তো বললেন, ভালো না। অর্থাৎ বইখানা ভালো বিক্রি হবে না। বইখানা কাটতির দিক থেকে দেখে সে বিচার করেছে। সুতরাং চমৎকার যে, সে দপ্তরির হাতেই একরকম আর Publisher-এর হাতে আরেক রকম। আবার একজন বিজ্ঞ পণ্ডিতের হাতে দেন, তিনি দেখবেন বইখানার ভিতর সারবস্তু কতটুকু আছে। এভাবে একখানা পুঁথিকেই তিনটি দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হল এবং একজনের মতের সাথে আরেকজনের মতের মিল নেই দেখা গেল। ঠিক তেমনি ধর্মের দৃষ্টি একটি অভিনব প্রকারের দৃষ্টি। এটি একটি গুণানুবন্ধী দৃষ্টি— qualititative valuation।

এই quality-কে জগৎ থেকে উড়িয়ে দেবার কারো কোন ক্ষমতা নেই। Quality-কে quantity-তে পর্যবসিত করেই একথা বলা হয়ে থাকে। এ গেল বিজ্ঞানের তরফের প্রথম দাবির কথা। এছাড়া বিজ্ঞানের আরেকটি বড় গর্ব হচ্ছে Evolution Theory বা ক্রমাভিব্যক্তিবাদ। সব কিছুই ক্রমাভিব্যক্তির দ্বারা হয়েছে। এ Theory-টার বড় আবিষ্কর্তার নাম Darwin। আজ ৩০০ বছর ধরে

এ Theory চলে আসছে। ডারউইনের evolution বলতে biological evolution-ই বুঝাত। এখন সর্বত্রই evolution কথাটির ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। যেমন, একটা স্কুলেরও evolution হচ্ছে। ত্রিশ বছর আগে কি রকম ছিল, ক্রমাভিব্যক্তির দ্বারা কিভাবে বর্তমান অবস্থা এসেছ। এভাবে evolution শব্দটির ব্যাপক প্রয়োগ চলছে। Drawin-এর Evolution Theory এখন স্কুলেও পড়ান হয়। Bible যে বলেছে, ভগবান আগে আদম ও ইভকে সৃষ্টি করলেন। অর্থাৎ জোড়া জোড়া মানুষ, জোড়া জোড়া বাঁদর, জোড়া জোড়া হাঁস ভগবান পৃথিবীতে পাঠিয়ে দিলেন—একথা এখন আর চলে না!

সামান্য একটা protoplasmic cell থেকে ধীরে ধীরে সব এসেছে। একটি cell দু'ভাগে ভাগ হয়ে দুটি হল, দু'টি থেকে চারটি—এভাবে ধীরে ধীরে ক্রম-অভিব্যক্তির পথে এসেছে বানর, শিম্পাঞ্জি,তার পরেই আমরা অর্থাৎ মানুষ। মানুষ হয়ে মেরুদণ্ড সোজা করে সে মাটির উপর দাঁড়িয়েছে। এ হতে বহু সহস্র বছর কেটে গেছে এবং পৃথিবীর বক্ষে এখন আমরা আছি; Top floor এই আমরা! প্রথম ধাতব জগৎ, তার উপর উদ্ভিদ জগৎ, তারপর প্রাণী এবং প্রাণীর মধ্যে আবার প্রথমে অমেরুদণ্ডী, পরে মেরুদণ্ডবিশিষ্ট। এভাবে একটি protoplasmic cell থেকে ধীরে ধীরে সব কিছু সৃষ্টি হয়েছে। শেষ স্তরে অর্থাৎ সর্বোচ্চ সিঁড়িতে আমরা আছি; আমাদের উপরে আর কিছু নেই। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' একথাটি আজকাল খুব প্রয়োগ হয়; কিন্তু কি অর্থে কথাটা একদিন চণ্ডিদাস বলেছিলেন? মানুষই সকলের উপরে, সুতরাং আমাদের কর্তব্য, মানবের কল্যাণ। মানুষের মঙ্গল কিসে? কি করলে মানুষ ভাল থাকবে? এসব ভাবনা করাই মানুষের কর্তব্য। এরই নাম এখনকার ভাষায় Humanism.

আগে যেমন ছিল Materialism এখন তার নাম Naturalism। Naturalism বললে Materialism-এর গালি বুঝায় না। আর আগের Atheist, অর্থাৎ যারা ঈশ্বর মানে না, এখন হয়েছে Humanism। এ নামটি অনেক ভদ্র। Humanist অর্থ হল মানবতাবাদী—মানবের কল্যাণ, মানবজাতির উন্নতি যাঁদের লক্ষ্য। মানবজাতির মঙ্গল চিন্তায় যাঁরা আছেন, তাঁরা সবাই Humanist, তারা সবাই বিজ্ঞানবিদ এবং সর্বদাই মানবের উন্নতির চিন্তা করছেন। তাঁরা বলেন ধর্মবিশ্বাসীদের—তোমরা মনে কর জগৎটা দুঃখময়, কেবল দুঃখ আর দুঃখ, এবং মৃত্যুর পরে কোথাও একটা নির্বাণ আছে, একটা মোক্ষ-টোক্ষ আছে যেখানে গেলে শান্তি হবে! কিন্তু তা নয়। জগতের মধ্যে যেমন দুঃখ আছে তেমন সুখও আছে। আমাদের কাজ শুধু মানুষের দুঃখ যাতে কমে এবং সুখ যাতে বাড়ে। আমরা চেষ্টা করছি, যাতে ধীরে ধীরে মানুষের সুখের মাত্রা বাড়ে এবং দুঃখের মাত্রা কমে। সুখ বাড়াতে বাড়াতেই একদিন আমরা সুখময় হয়ে যাব। অতএব, মানবকল্যাণের পথেই বিজ্ঞানের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে। পৃথিবীতে লোকসংখ্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে; যাক ভয় কি? আমরা ইতিমধ্যেই চন্দ্রলোকে জায়গা করে ফেলেছি, আপনারা বায়না করতে থাকুন। আমরা কোনদিন স্থান অসঙ্কুলান হতে দেব না। বিজ্ঞানের সাহায্যে আমরা নতুন নতুন স্থান আবিষ্কার করব। সে সব স্থান বাসের অযোগ্য হলে যোগ্য করে নেব। অতএব, আমাদের লক্ষ্য একমাত্র মানবের কল্যাণ, মানবের মঙ্গল এ উদ্দেশ্যেই যত শিক্ষালয়, যত প্রতিষ্ঠান, যত অনুষ্ঠান।

মানবিকতা, মানবত্ব ইত্যাদি গালভরা কথা শুনতে ভাল লাগে এবং এই মত-ই এখন Humanist-রা জোরে প্রচার করে চলেছে। এসব মুখরোচক শব্দ তাদের মুখে লেগেই থাকে। তাদের স্টেটের নাম হল— কল্যাণমুখী রাষ্ট্র, Welfare State। এ ধরনের প্রচার, ঈশ্বর-ভাবনা, ধর্ম ভাবনা, ঋষির দান ইত্যাদিকে উড়িয়ে দেবার উপক্রম করেছে। আমাদের কথা সম্পূর্ণ উল্টো। আমরা বলি আগে আমরা ভাল ছিলাম, ভাল থেকে ক্রমে মন্দের দিকে যাচ্ছি; আর Evolution বলে, আমরা মন্দ থেকে ক্রমে ভালোতে যাচ্ছি। আমরা বলি— আগে সেই মহাজ্ঞানী ঋষিরাই মানবের প্রকৃত কল্যাণের পথ একদিন বাতলে দিয়েছিলেন। তোমরা বল— Savage থেকে civilization এসেছে। আর আমাদের শাস্ত্র বলে— আগে সত্যযুগ, তারপর ত্রেতা, তারপর দ্বাপর এবং সর্বশেষ কলিযুগ; রামায়ণের যুগেই আমরা বেশি সভ্য ছিলাম ইত্যাদি। এই হল 'ধর্ম ধর্ম' যারা করে, তাদের অভিমত। Humanist-রা বলেন, আমরা আগে অসভ্য ছিলাম, ক্রমে ক্রমে আমরা সভ্য হচ্ছি। সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ কথা কিনা, তাই ধর্মরাজ্যের উপর Humanist-দের আঘাত অতি প্রচণ্ড। তাঁরা বলেন—ঈশ্বর বলে কিছু নেই, তাছাড়া মুনিঋষিদের রচিত বেদ-পুরাণ ইত্যাদি সব চাষার গান, বালকের সঙ্গীত। আগের কালের লোক প্রকৃতির রহস্য জানত না, তাই তারা বলত, দেব-দেবী আছে—তাঁদের স্তব কর, স্তুতি কর, নচেৎ তাঁদের কোপে পড়বে। মোট কথায় বললে দাঁড়ায়, বাপঠাকুরদাদা সব বোকা ছিলেন এখন আমরা বুদ্ধিমান হয়েছি; সুতরাং তাঁদের কথার কোনো দাম আমরা আর দিতে রাজি নই।

এবারে আমাদের তরফের উত্তরটি বলি। মানবকল্যাণ যে সবার বড়, এটা আমরাও স্বীকার করি। আমরা শুধু আপনাদের কল্যাণ কথাটির একটি সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দাবি করি। মানুষের কল্যাণটা কি? কল্যাণের একটি নির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকলে যে কল্যাণকামীরা মারামারি করে মরবে। আমিও কল্যাণ চাই, আপনিও কল্যাণ চান; অতএব, এ দু'য়ে ঠোকাঠুকি লাগার ত কোনো কারণ থাকতে পারে না। যাঁরা মনে করেন Democracy-তেই কল্যাণ হবে, তাঁরাও কল্যাণকামী, আর যাঁরা মনে করেন Communism-এ কল্যাণ হবে, তাঁরাও ত কল্যাণকামী। তাই যদি হয়, তবে কল্যাণকামীতে কল্যাণকামীতে প্রতিনিয়ত মারামারি লেগে আছে কেন? কাজেই মারামারি করবার আগে কল্যাণ সম্বন্ধে একটা সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছান দরকার। অর্থাৎ কি হলে আমরা বুঝব যে সত্যি সত্যি মানবের কল্যাণ হল। ব্যক্তির বলেন, সমাজের বলেন, পৃথিবীর বলেন, জগতের বলেন, কি হলে আমরা বলব যে, সত্যি সত্যি কল্যাণ হয়েছে? কি হলে আমরা বলব—একটা দেশের কল্যাণ হয়েছে, দেশটি কল্যাণের পথে এগিয়ে চলেছে?

একখানা পুঁথি হাতে পড়ল— "সমৃদ্ধির পথে ত্রিপুরা"। পুঁখিখানি খুলে দেখি অনেক কাঁচা রাস্তা পাকা হয়েছে, অনেক বড় বড় building তৈরি হয়েছে, অনেক বড় বড় plan হয়েছে, যেখানে বাঁশের সাঁকো ছিল সেখানে concrete-এর bridge হয়েছে ইত্যাদি কি কি হয়েছে তার একটা লিস্ট দেওয়া আছে পুঁথিখানার ভিতর। অর্থাৎ আমরা এই করছি, এই করবো, ছবি এঁকে সব দেখান হয়েছে plan-সমূহ কার্যে পরিণত করতে কত কোটি কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে তারও একটা হিসেব দেওয়া আছে। সংক্ষেপে— এই হয়েছে, এই করেছি, এই করব ইত্যাদি ইত্যাদি। খতিয়ে দেখলে দেখা যায় আমাদের চলাফেরার এবং খাওয়াদাওয়ার অনেক সুবিধা করা হয়েছে। খাদ্যের production অনেক বেড়েছে। শীঘ্রই আমরা self-supporting হয়ে যাব। চলাফেরার আরও অনেক সুবিধা করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। সুবিধা অনেক হয়েছে এবং হবে— এতে কোন সন্দেহ নেই। Supersonic plane শব্দের গতির চেয়ে দ্রুত চলতে পারে। Plane আসার শব্দ শুনবার আগেই বোমা পড়ে গেছে। অনেক সুবিধা হয়েছে। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, means of transportation এবং means of communication-এর ব্যবস্থাই বেশি হয়েছে। হাজার হাজার মাইল দূরে বসে কেবল চাবি ঘুরিয়েই আমরা কথাবার্তা চালাতে পারি। কথা হল—এগুলিই সমৃদ্ধি কি না? বিষয়টি আগে স্থির হয়ে যাক—এগুলিকেই আমরা সমৃদ্ধি বলব কি না? মানুষ মিথ্যা কথা বলুক, চুরি করুক, ঘুষ খাক, ছাত্র-strike চলুক, মাস্টারের srtike চলুক—তবুও একেই আমরা উন্নতি বলব কি না—এটাই আগে সিদ্ধান্ত হয়ে যাক।

উন্নতির একটা স্পষ্ট সংজ্ঞা আমরা শুনতে চাই। আমরা কোনো সংজ্ঞা দিতে বসিনি, আমরা শুধু বলি আপনারা একটা সংজ্ঞা ঠিক করে অগ্রসর হন, নচেৎ যে দিশেহারা হয়ে যাবেন। আপনারা দাবি করেন, আপনারা কল্যাণকামী, আপনার শত্রু যে, সেও ত কল্যাণকামী। তবে এত ঝগড়াঝাঁটি কেন? তাই কল্যাণ সম্বন্ধে সকলে মিলে যদি একটা সংজ্ঞা ঠিক করে নেন, এবং স্কুল-কলেজের ছাত্র শিক্ষক সকলের মাথায় সেটা ঢুকিয়ে দেন, তাহলেই ত আমরা একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচি। কিন্তু কল্যাণ ঠিক না করে রাষ্ট্র চালাবেন—এটা ত ভাল কথা নয়। কোথায় যাবেন, সেটা ঠিক না করে যদি speed বাড়াতে থাকেন, ঘণ্টায় ৬০ মাইল চলতে চলতে যদি ব্রেক কষতে হয়, তাহলে যে ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবেন গাড়ি শুদ্ধ। Speed কম থাকা অবস্থায় ব্রেক কষলে হয়ত মরতে নাও পারতেন। কোথায় যাচ্ছেন—জিজ্ঞেস করলে যদি বলেন, এইত একটু ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমরা শুধু প্রশ্ন করছি—মিছি মিছি ঘুরছেন কেন? আমি রাস্তায় দাঁড়িয়ে ভাবছি, আপনি এসে বললেন, যাবেন নাকি আমার car-এ, তারপর আমায় তুলে নিয়ে খানিক ঘুরিয়ে এনে বললেন—আপনার কত উপকার করলাম। কি উপকার করলাম? আমি কোথায় যাব আপনি জানেন না, কাজেই এতে আমার কল্যাণ কি করে হল? কোথায় যাবো সেটা জেনে যদি আমায় সেখানে পৌঁছিয়ে দিতেন, তাহলে না হয় আমার কল্যাণ হত।

কোন্ দিকে যাব ঠিক না করে খানিক এগিয়ে গেলে গন্তব্যস্থান থেকে অনেক পেছনেও পড়ে যেতে পারি। সেটা আমার কল্যাণ না হয়ে বরং অকল্যাণই হল। স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছেন; গাড়ি এসে পড়েছে তুফান মেইল—এ গাড়ির speed সবচেয়ে বেশি তাই উঠে বসলেন—খানিকটা পরে দেখেন, কি সর্বনাশ, উল্টো প্ল্যাটফরমের গাড়িতে উঠে পড়েছি। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে এখন নামতে গেলেও মুস্কিল। সুতরাং speed বেশি হলেই কল্যাণ আসে না। রাস্তা concrete হলেই কল্যাণ আসে না। স্কুলের চেয়ার-টেবিল, বিল্ডিং ইত্যাদিতে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করলেই কল্যাণ আসে না। কাজেই যাঁরা মানুষকে চালন, পালন, শাসন ইত্যাদি করেন, নানা প্রকার আইন বিধিবদ্ধ করেন—তাঁরা মানবকল্যাণের সঠিক সংজ্ঞা আজও স্থির করে উঠতে পারেননি। কল্যাণের যখন কোনো সংজ্ঞা নেই, তখন আর অসুবিধা কি? তা'ছাড়া আমরা ত প্রগতিশীল দেশকেই অনুকরণ করছি। এসব আমেরিকায় আছে, ইউরোপে আছে, সমস্ত শিক্ষিত দেশে আছে, তাই আমরাও করছি। মোটকথা, একটা কল্যাণ ঠিক করে যদি দেখান যে, এইত কল্যাণ হল, তা'হলে আমরাও বলব—ভালই ত করলেন; কাজেই আমাদের দলের প্রথম কথাটা হল, লক্ষ্য স্থির করে আপনাদের চলতে অনুরোধ করছি। মানবকল্যাণ, বিশ্বের মঙ্গল একি শুধু পুঞ্জীভূত খাদ্যসম্ভার হলে হয়, দালান-কোঠা হলেই হয়, concrete-এর রাস্তাঘাট হলেই হয় বা দ্রুত চলার যানবাহন হলেই হয়?— এ প্রশ্নের সমাধান আগে দরকার। আমরা বলি কি হলে মানুষের সত্যি সত্যি কল্যাণ হবে, সেটা আরও একটু গভীরভাবে ভেবে দেখা দরকার।

এতক্ষণ বিজ্ঞানের বাইরে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলাম, এবার বিজ্ঞানের মধ্যে দাঁড়িয়ে কিছু বলব। Evolution Theory-র কথা ধরেই বলি। প্রথমে উদ্ভিদ তারপর প্রাণী। উদ্ভিদের মধ্যে চলার শক্তি দেখতে পাওয়া যায় না, তা হলে প্রাণীর মধ্যে এ চলার শক্তিটা কোথা থেকে আমদানি হল? এরপর যখন আবার মানুষে এলাম, তখন দেখি, বুদ্ধি নামক একটি অতিরিক্ত শক্তি সে লাভ করেছে। ইতর প্রাণীতে বুদ্ধি নামক একটা জিনিস আছে, তবে সেটা intellect নয়, সেটা instinct। এই instinct আর intellect এক জিনিস নয়। Intellect যার আছে, সে plan করতে পারে। মানুষ যে ঘরবাড়ি করে, তার একটা plan আছে, কিন্তু শেয়াল যে গর্ত করে তার পেছনে কোন plan নেই। এখন প্রশ্ন হল—ক্রম-অভিব্যক্তির পথে এই যে চলার শক্তি এবং বুদ্ধিশক্তি নামে দুইটি স্বতন্ত্রশক্তি এসে গেল, এরা এল কোত্থেকে? এভাবে দেখা যায়— এক একটি স্তরে যেন এক একটি নতুন শক্তির আবির্ভাব হচ্ছে। এই যে এক একটি স্তরে একটি নতুন virtue-র আমদানি হচ্ছে— এর রহস্য কি? বিজ্ঞান বলে—প্রাণ থেকেই প্রাণের উদ্ভব। অপ্রাণী থেকে প্রাণী আসতে পারে না। তবে প্রাণ এল কেমন করে? বিজ্ঞান এখানে চুপ করে আছে, তবে তাঁরা নিরাশ হননি। তাঁরা বলেছেন, পারব আমরা আবিষ্কার করতে—একটু সবুর করুন। একটা প্রাণ থেকেই আর একটা প্রাণ আসছে। তাহলে নিশ্চয়ই একটা প্রাণ কোথাও আছে, যেখান থেকে হঠাৎ সে এসে পড়েছে। একটা প্রাণ যদি পাওয়া গেল, তবে প্রাণ সৃষ্টির আর কোন অসুবিধা নেই। একটা ম্যাচের কাঠি যদি পাওয়া গেল, তবে বাড়ির পর বাড়ি

পুড়িয়ে ফেলতে কোন অসুবিধা হবে না। কোত্থেকে যে প্রথম কাঠিটা—প্রথম প্রাণটা এল, বিজ্ঞান এখনও তা বলতে পারছে না।

চলার শক্তি, বুদ্ধি এসব virtue সম্পর্কে বিজ্ঞান বলেছেন— এসব emergent virtue অর্থাৎ এসে পড়েছে, পথের মধ্যে হঠাৎ মিলে গেছে। Chemistry-র ছেলেরা জানে, নুনের যে আস্বাদ, তা Sodium বা Chlorine-এর মধ্যে নেই। Hydrogen আর Oxygen-এর কোনটার মধ্যেই তৃষ্ণা নিবারণের শক্তি নেই। এদের দু'য়ের মিলনে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তা তৃষ্ণা দূর করতে পারে। এই যে নুনের আস্বাদ এবং জলের গুণ— এরা সব emergent virtue। এ হল বিজ্ঞানের অভিমত। Chemical combination হলে এ ধরনের নতুন নতুন গুণ যেন কোত্থেকে এসে পড়ে। যদি জিজ্ঞেস করেন কোত্থেকে এল— বিজ্ঞান বলবে, দেখছেন না মশাই এসে পড়েছে চালাকি করেন কেন? আমি seriously জিজ্ঞেস করছি— কোথা থেকে এল? আপনি বলছেন— উনি এসে পড়েছেন। এসে যে পড়েছেন, তা ত আমিও দেখছি, আপনিও দেখছেন। আপনি একটা নূতন শব্দ emerget বলে আপনার অজ্ঞতা ঢাকবার চেষ্টা করছেন কেন? কিন্তু আমরা যদি একবার আমাদের রাজ্যের মধ্যে আসি, ঈশ্বরের রাজ্যের মধ্যে আসি তাহলে এর উত্তর আছে। আমাদের উত্তর হচ্ছে, ধরুন একখানা বাড়ি তৈরি হচ্ছে। আপনি যদি বলেন—এতদিন ত শুধু কতকগুলো ইট পড়েছিল। এখন খোয়া এল কোত্থেকে? সুরকি এল কোত্থেকে? ভিত গাঁথা হয়ে গেল দেখছি, এবার দেয়ালও ধীরে ধীরে উঠছে। আমরা বলব— বাড়ির একজন মালিক আছে কিনা, সে পাঠাচ্ছে। যার plan মত বাড়ি হচ্ছে, সেই সব সময় মত পাঠিয়ে দিচ্ছে। এর ছাদ তৈরি হবে, দেখছেন না লোহা, লক্কড়, বীম, বরগা সব এসে পড়েছে? নতুন নতুন মালগুলি বাড়ির কর্তাই সময় মত পাঠিয়ে দিচ্ছে। আপনার মতে তো বাড়ির মালিক নেই, তাই আপনি বললেন— এসে পড়েছে। মালগুলি আসছে কোত্থেকে, নতুন মালটা দিচ্ছে কে? এবার বুঝলেন তো আমার পার্থক্যটা। খেতে বসেছেন, একটার পর একটা খাবার আসছে। উঠতে যাচ্ছেন— বাড়ির কর্তা বলেন, বসুন বসুন। তারপর ঐ দেখুন, দৈ এল, রসগোল্লা এল। বাড়ির কর্তার একটা প্ল্যান আছে, সেভাবেই একটার পর একটা খাবার পাতায় দিচ্ছেন। আপনি যদি বলেন, বাড়ির কোন মালিক নেই, সন্দেশ রসগোল্লা সব দোকান থেকে এসে যাচ্ছে, আমি বলব, অমনি অমনি আসতে পারে না। প্রকৃতির যে অভিব্যক্তি চলছে, তার যে বিশ্লেষণটা আপনি দেন তাকে আমি বলব কুলি-মজুরের বিশ্লেষণ। এ বাড়িটা তৈরি হতে কতগুলো কুলি-মজুর খেটেছে তার একটা পরিষ্কার হিসেব আপনি দিচ্ছেন। কিন্তু আমি বলব এ হিসেবটিই বাড়ির পরিচয় নয়। এ বাড়ির পিছনে নিশ্চয়ই কোন প্ল্যানওয়ালা আছে। এ বাড়িটা করার জন্য কোন ব্যক্তির শুধু প্ল্যান না, খরচও আছে। শুধু প্ল্যান-এ হয় না। সে ব্যক্তির ভিতর প্রেম আছে, ভালোবাসা আছে। এরকম একটি বাড়ি তৈরি করার জন্য বহুদিন থেকেই ছবি এঁকেছে, মাল-মসল্লা যোগাড় করেছে এবং এখন কাজ শুরু হয়েছে। আপনি কোন প্ল্যানওয়ালাকে স্বীকার করেন না, তাই বলেছেন আপনি আপনিই সব কিছু সৃষ্টি হচ্ছে।

দ্বিতীয় কথা হল—বিজ্ঞান বলেছে যে, এ অভিব্যক্তির ভিতর দাঁড়াবে কে? যে fit সে-ই দাঁড়াবে। Survival of the fittest—এই হল বিজ্ঞানের আবিষ্কার। জোর যার, তারই টিকে থাকার অধিকার আছে। কেবল ধাক্কাধাক্কি চলছে— struggle for existence। এ যুদ্ধে কত কত প্রাণীর ধরাপৃষ্ঠ হতে চিরতরে বিদায় নিয়েছে। অনেক প্রাণীর কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়েছে, যারা extinct হয়ে গেছে। এভাবে এ evolution এর পথে কত জোরহীন প্রাণী চলে গেছে। যারা environment-এর সাথে adjust করে উঠতে পারেনি, তারাই চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। বিজ্ঞানের একথা যদি মেনে নিতে হয়, তাহলে মানবের কল্যাণে যে আপনারা খাটছেন, তারও ত খুব বেশি দাম থাকল না। মানবও ত একদিন এ পৃথিবী হতে, extinct হয়ে যেতে পারে? মানুষ যে চিরকাল মানুষই থাকবে, তার guarantee কোথায়? এখন যে মানুষ হচ্ছে, তারাও যে একদিন বিদায় নেবে না, তা কে বলতে পারে? কত প্রাণী চলে গেছে, তাদের কঙ্কাল আজও মাটি খুঁড়ে বের করা হচ্ছে। বিশ ত্রিশ হাজার বছর পরে যারা থাকবে, তারা হয়ত মানুষের কঙ্কাল বের করে বলবে, বহুদিন আগে মানুষ নামে একটি প্রাণী এ পৃথিবীতে বাস করত। সুতরাং মানবের কল্যাণ—এ কথাটা কেমন শুনাচ্ছে না? Environment-এর সাথে ধস্তাধস্তি করে টিকে থাকার ক্ষমতাকেই fitness বলা যায়। ক্ষমতা যার আছে, সে-ই টিকবে। মোটা বাংলায় বলা যায়, "জোর যার মুল্লুক তার" এবং এ theory-ই চলছে আজ পৃথিবীর সর্বত্র।

জোর যার আছে, সে-ই টিকবে—এই যদি theory হয়, তা'হলে কল্যাণ theoryটি খুব দুর্বল হয়ে পড়ল না কি? কল্যাণ মানেই—যার জোর বেশি সে যা করবে, তাই কল্যাণ। সে যা কল্যাণ মনে করবে সেটাই মানব কল্যাণ। মানবকল্যাণ কি অত সোজা কথা? Fitness মানে কি physical fitness? আমাদের যদি জিজ্ঞেস করেন, তাহলে আমরা বলব—আপনাদের এ survival of the fittest theory-টাকে উল্টে দিন। আপনারা বলেন, fit যে সেই survive করবে। আর আমরা যাদের কথায় চলি, সেই ঋষিদের কথাই আমাদের মতটা বলি। ধরুন, আপনি রাস্তায় যেতে যেতে দেখলেন, একটি নতুন বাড়ি তৈরি হয়েছে। বাড়িতে ঢুকে দেখলেন, বাড়িতে লোকজন নেই, বাড়ির ভিতরে বৈঠকখানা আছে, চেয়ার-টেবিল, খাট-পালঙ্ক ইত্যাদি সব ভাল ভাল আসবাবপত্র সাজানো আছে। শোয়ার জায়গা আলাদা, রান্নার জায়গা আলাদা বেশ ভালো বন্দোবস্ত। দেখে আপনার নিশ্চয়ই মনে হবে, বেশ বিশিষ্ট উচ্চশিক্ষিত ভাল একটি পরিবারের থাকার মত করেই বাড়িখানা তৈরি করা হয়েছে। বাড়িওয়ালার মাথার মধ্যে একটা প্ল্যান আছে যে, কি রকম একটা পরিবার এসে এখানে বাস করবে। নিতান্ত একটা চাষী পরিবারের জন্য নিশ্চয়ই নয়। কারণ গরু রাখার কোন ঘর বাবান হয়নি, বরং গাড়ি রাখার গ্যারেজ বানান হয়েছে। কাজেই মোটরগাড়িওয়ালা কোন বিশিষ্ট

পরিবারের থাকার মত করেই বাড়িখানা তৈরি করা হয়েছে। এর আগে থেকে ভাড়াটিয়ার একটা ধারণা করে নিয়েই বাড়িওয়ালা প্ল্যান এঁকে নিয়েছে। ঐ বাড়িতে যে আসবে, তার মত করেই সব fit করে রাখা হয়েছে।

এ পৃথিবীও একটি স্থান, যেখানে মানুষ এসে বসবাস করার লক্ষ লক্ষ বছর আগে একটা plan তৈরি হয়েছে। এখানকার বাতাস, এখানকার জমির উর্বরতা, এখানকার মাটির শৈত্য ও উষ্ণতা—এ সবই মানুষের উপযোগী করে ধীরে ধীরে তৈরি করা হয়েছে। পৃথিবীর অভ্যন্তরে যে উষ্ণতা, তাতে মানুষ সেখানে বাঁচতে পারে না। হিমালয় পাহাড়ের চূড়ায় যান, সেখানে Oxygen, জল সব কিছু সাথে করে নিয়ে যেতে হবে। যদি চন্দ্রলোকে যেতে চান তাহলেও এ ধরনের অনেক কিছু আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে হবে। এ পৃথিবীটার সৃষ্টি হয়েছে আমাদের আসার অনেক আগে। তখনকার অবস্থা ভাবুন ত। বাড়িতে ভাড়াটিয়া আসার আগেই যেমন বাড়িওয়ালা ভাড়াটিয়ার উপযুক্ত করে বাড়িটি তৈরি করে রেখেছেন, ঠিক তেমনি, পৃথিবীর যিনি মালিক তিনিও মানুষের মত একটি প্রাণী এসে যেন বসবাস করতে পারে, এমনিভাবেই পৃথিবীকে আগে থেকেই সাজিয়ে রেখেছেন। আপনি বলেন, যে fit সেই শুধু survive করবে। আর আমরা বলি, পৃথিবীকে এমনভাবে fit করা হয়েছে, যাতে আমরা এসে survive করতে পারি। আমরা আসার আগেই পৃথিবীটাকে fit করে রাখা হয়েছে। একটু তাকিয়ে দেখুন, সন্তান আসবার পূর্বেই মাতৃস্তন্যে দুগ্ধের সঞ্চার হয়েছে। সন্তান যে আসবে, তার জন্য পূর্ব হতেই plan মত প্রস্তুতি চলছে। আপনি বলবেন, ওসব natural, ওসব আপনিই হচ্ছে। অমনি অমনি হতে পারে? মাতৃস্তন্যে দুগ্ধ অমনি অমনি এসেছে? বাড়িওয়ালার বাড়ির ভিতর যে চেয়ার-টেবিল হয়েছে, অমনি অমনি হয়েছে? কোন plan ছাড়া কুলি-মজুরেরা ওসব রেখে গেছে? আমি বলি কুলি-মজুরকে হুকুম করা হয়েছে যে ওখানে একখানা arm chair রেখে এস, কারণ arm chair-এ বসার মত একটা লোক আসছে। আসবে হয়ত অনেক দিন পরে।

আমরা তাই বলি, এ পৃথিবীতে মানুষ বাস করবে, এ ভাবনা করেই মানুষ বাস করার উপযোগী করেই ধীরে ধীরে একে তৈরি করে তোলা হয়েছে। একটা বড় plan ওয়ালা আছেন, একটা বড় চিন্তাশীল কেউ আছেন, যিনি ভাবনা করেছেন যে এখানে একদিন এসে মানুষ থাকবে এবং সেভাবেই তিনি প্রস্তুতি চালিয়েছেন। তাঁর শুধু plan নেই, plan-এর পেছনে প্রাণও আছে; যাতে এখানে এসে আমরা ভালোভাবে থাকতে পারি, সুখে থাকতে পারি। আমাদের দরকার মত বৃষ্টি হয়, ঠিকমত সূর্যের তাপ আমরা পাই, যাতে আমরা বেঁচে থাকতে পারি। এভাবে বাড়িওয়ালাই plan করে সব ঠিক করে রেখেছেন। এখন, আমাদের কোন অসুবিধা হলে আগে বাড়িওয়ালাকে ত খবর করতে হবে। বাড়িওয়ালার বাড়িতে বাস করছি, বিশ্বাস করি বলেই কোন অসুবিধা হলেই আগে তাকে ডাকি। বাড়িওয়ালার বন্দোবস্ত দেখে বুঝতে পারি যে, তার দয়া আছে, তাই দয়া ভিক্ষা করি। তাকে ডেকে বলি, দয়া করে আমার এ অসুবিধাটা দূর করে দেন। আমার ঠাকুরঘরটি ছাদের চিলে-কোঠায় করে দেন। তিনি ইচ্ছে করলে করে দিতে পারেন। বাড়িওয়ালাকে খবরাখবর করার রাস্তা আবিষ্কার হয়েছে। খবর করে তার সাড়া পাওয়া গেছে। দেখুন না আপনার পাশের ভাড়াটিয়া বাড়িওয়ালাকে খবর দিয়ে ছাদের চিলে-কোঠায় তার ঠাকুরঘর করে নিয়েছে। যদি দেখি, বাড়িওয়ালাকে ডেকে অনেকেই অনেক সুবিধা করে নিয়েছে, তা'হলে আমি কেন তাকে ডাকব না? দেখছেন না, ঠাকুরঘরে গিয়ে তাকে জানাবার পর ওর ছেলেটা সুস্থ হয়ে উঠল। তা'হলে আমার ছেলের রোগমুক্তির জন্য আমিই বা তাকে ডাকব না কেন? তাকে বলব না কেন? আপনি বিজ্ঞানী বলবেন, আমার ঠাকুর ঘরে জানাবার কেহ নাই। আমি বলব, আপনার বিজ্ঞানের কথা বলবার অধিকার নেই যে, ঠাকুরঘরে কেহ নেই বা ওখানে গিয়ে কিছু জানাবেন না। ঠাকুরঘরে গিয়ে আমি যা পেলাম তা দেবার অধিকার যতক্ষণ আপনার না হয় ততক্ষণ একথা আপনি কিছুতেই বলতে পারেন না। আপনি বলছেন, কর্তা নেই, সব কুলি-মজুরেরা করেছে! আমরা বলি, যদি কুলি-মজুরই সব করে থাকে, তাহলে চিলে-কোঠায় ঠাকুরঘর হবার আর কোন সম্ভাবনা নেই। বাড়িওয়ালা কর্তা কেউ যদি না থাকে, তাহলে সে সম্ভাবনা কোথায়? যদি কতগুলো পরমাণু evolution-এর সহায়তায় এ পৃথিবী সৃষ্টি করে থাকে, তা'হলে পূজা-প্রার্থনার কোন দাম নেই। আর যদি মালিক থেকে থাকে, থাকে যদি কর্তা কেউ, তাহলে প্রার্থনার মূল্য নিশ্চয়ই আছে।

জগতের মধ্যে অচিন্তিত, অপ্রাকৃত ঘটনা ঘটে যাচ্ছে শত শত—তার দৃষ্টান্ত আমরা দিতে পারি। আপনারা বললেন, মানুষ না খেয়ে বেঁচে থাকতে পারে না। আমি এমন মানুষ দেখাতে পারি, খাচ্ছে না কিছুই। আপনি বললেন শ্বাস-প্রশ্বাস না নিয়ে মানুষ বেঁচে থাকতে পারে না। আমি এমন মানুষ দেখাতে পারি যে শ্বাস-প্রশ্বাস নিচ্ছে না, অথচ জীবিত আছে। তাহলে Science-এর failure হল। হ্যাঁ হচ্ছেই ত, শত শত জায়গায় হচ্ছে। There are more things in heaven and earth than philosophy dreamt of—শেক্সপীয়ারের এ উক্তি আপনারা জানেন। আমরা যা ভাবছি, তার চেয়ে কত চমকপ্রদ ঘটনা অহরহ ঘটে যাচ্ছে জগতে। সুতরাং প্রকৃতির অতীত কিছু নেই, প্রকৃতির বাইরে কিছু নেই আপনার বিজ্ঞানের আবিষ্কারেই আপনি ঠেকে পড়েছেন। Emergent virtue, Evolution Theory, survival of the fittest ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করে দেখান গেল। আমরা বলি, এসবের পেছনে একজন plan ওয়ালা আছে।

পৃথিবীতে মানুষ নামক এক প্রকার জীব আসবে তাই ধীরে ধীরে সে সব প্রস্তুত করে রেখেছে। যদি দেখা যেত যে একটা বাড়ি হচ্ছে, আবার তাকে ভেঙ্গে ফেলছে, আবার গড়ছে, সব কিছু যেন একটা chaos তা'হলে বলা চলত যে, না কোন plan ওয়ালা এর পেছনে নেই। কুলি-মজুররাই যা খুশি করছে। আপনিই বলছেন, ধীরে ধীরে অভিব্যক্তি হয়েছে, অতএব একটা plan আছে, এর পেছনে একটা বিরাট বুদ্ধিমান কেউ আছে। তার বুদ্ধিমত্তা স্বীকৃত হলে, তার সত্তার স্বীকৃতি আসে, তার ভিতর ভবিষ্যৎ দৃষ্টি স্বীকৃত হয়। আমি আসব, আমার জন্য তার দরদও দেখা যায়। অতএব

আপনার বিজ্ঞানের কথায়ই আপনি প্রকারান্তরে সব স্বীকার করলেন। আমার ধর্মশাস্ত্র ছাড়াই এসব প্রমাণিত হয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান যেখানে গিয়ে পৌঁচেছে, সেখানে তাকে স্বীকার করতে হচ্ছে যে, একটা বড় কিছু আছে এবং যা আছে, তাকে সে ধরতে পারছে না, তার সম্বন্ধে কিছু বুঝতে পারছে না। এ কারণে বিজ্ঞানী Einstein বলেছেন—আর একটা বড় শক্তি যদি না মানি তবে ক্যালুলেশান-এ যেন ভুল হয়। খানিক যোগ বিয়োগ করেও যেন কিছু বাকি থাকে। আর একটা কিছু মানতেই হবে। নচেৎ অঙ্ক মিলে না। তার সত্তা কিরূপ, তার রূপ-গুণ কি—তা আমরা জানি না। তাহলে, তার সম্পর্কে কিছু বলার অধিকারও আপনার নেই।

খুব একজন নাম করা বৈজ্ঞানিক Sir William James—তিনি ঈশ্বর মানতেন না। কিন্তু যাঁরা মানতেন, তাঁদের সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ দরদ ছিল। কারণ, তিনি দেখেছেন যে পৃথিবীর কোটি কোটি লোক ঈশ্বর মানে। তিনি অনেক ঈশ্বর-বিশ্বাসী সাধারণ লোকের সাথে মিশে মিশে তাদের মনের ভাব জেনে একখানা পুঁথি লিখেছেন " Varieties of Religious Experiences" ; তার মধ্যে তিনি বৈজ্ঞানিকদের সাবধান করে দিয়েছেন এই কথা বলে যে, ঈশ্বর বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই—একথা কখনও মানুষের কাছে প্রচার করবেন না! কারণ ঈশ্বর-বিশ্বাস মানুষকে যা দিতে পারে, আপনারা কিছুতেই তা দিতে পারেন না। ঈশ্বর নেই—একথা মানব সমাজে বলবার আমাদের কোন অধিকার নেই। একটি ব্যাধিগ্রস্ত ছেলের মাতা যখন ঠাকুর মন্দিরে ঢুকে কিছুক্ষণ পরে বেরিয়ে এল, তখন দেখা গেল, তার দুঃখভারাক্রান্ত মুখে উজ্জ্বলতার ছাপ পড়েছে। সে যেন তার মনের ব্যথা কাউকে জানিয়ে এসেছে, এবং যাকে জানিয়েছে সে তার কথা শুনেছে এবং তার ছেলেকেও ভাল করে দেবে। ব্যাধিগ্রস্ত সন্তানের মাতার মনের এ পরিবর্তন আপনারা আনতে পারেন না। আপনাদের laboratory তে এর কোন যন্ত্র বা chemicals নেই, অঙ্কের কোন ফরমুলা বা ইকুয়েশান নেই। কাজেই যতদিন না আপনি সে ধরনের একটা কিছু আবিষ্কার করতে পারছেন, ততদিন তাকে বিশ্বাস করতে দেন যে, ভগবান আছেন। তার এ বিশ্বাসটুকু কেড়ে নেবার আপনার কী অধিকার আছে।

সুতরাং ঈশ্বর-বিশ্বাস মানবসমাজকে এমন অমূল্য জিনিস দান করতে পারে যে, এ থেকে তাকে বঞ্চিত করা কিছুতেই চলতে পারে না। তা'ছাড়া বস্তুর সত্তা না থাকলেও সে কল্যাণ করতে পারে। যেমন, বঙ্কিমবাবুর 'আনন্দমঠের'নায়ক-নায়িকা জীবানন্দ এবং শান্তি— এরা বাস্তবে ছিল কি না, কারো জানা নেই। আপনি যদি এখন সারা বাংলা খুঁজতে আরম্ভ করেন—তাদের বাড়ি কোন স্থানটায় ছিল? যেখানে সন্তানেরা 'মা' জগত্তারিণীর পূজা করত, সে জঙ্গলটা কোথায়? তাহলে দেখবেন, সবই হয়ত বঙ্কিমবাবুর কল্পনা। কিন্তু পুঁথিখানা বাঙালি সমাজকে মহামূল্যবান সম্পদ দান করেছে। ভারতের স্বাধীনতার মূলে এর অবদান সামান্য নয়। এখন যদি জীবানন্দ বলে কাউকে খুঁজে না-ও পাওয়া যায়, তবু জীবানন্দের কাহিনী যে মানব-সমাজে প্রভূত কল্যাণ করছে, তাতে অবিশ্বাসের কোন কারণ নেই। আজও "বন্দেমাতারম" মন্ত্র দেশের আবাল-বৃদ্ধকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। এক সময় বন্দেমাতরম্ শুনলেই ইংরেজ ভয় পেয়ে যেত এবং arrest করতে ছুটত। 'মা' কে প্রণাম করলে ইংরেজ ভাবত আমাদের তাড়াবে বুঝি। আপনি অনুসন্ধান করছেন জীবানন্দ ছিল কি না? এটা তো বড় কথা নয়! জীবানন্দ নামে কোন সন্তান ছিল না—এটা না জানলেও বন্দেমাতরম মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হওয়া যায়। ঈশ্বরতত্ত্ব সম্বন্ধেও সেরকম, যদি সে বস্তু খুঁজে না-ও পাওয়া যায়, তথাপি তাঁর ভাবনা, conception of God সহস্র সহস্র বছর ধরে মানুষের কল্যাণ সাধন করে চলেছে, এই ঐতিহাসিক সত্য উপেক্ষা করার উপায় নেই।

যদি বলেন যে, ক্ষতিও করেছে, তা'হলে বলব বেশি মূল্যবান বলেই ক্ষতি করেছে। ঘি খুব মূল্যবান খাদ্য, কিন্তু যদি পচে যায়, তবে বিষে পরিণত হয়। কিন্তু আপনার এই টেবিলটা যদি পচে যায়, তহলে বিষ হয় না। ঈশ্বর-বিশ্বাসটা অত্যন্ত মূল্যবান বলেই আপনি সেটা নিয়ে এত অসদ্ব্যবহার করেছেন এবং এখনও করছেন। ধর্ম জিনিসটা অত্যন্ত মূল্যবান বলেই রাষ্ট্র তাকে হাতে নিয়ে মানুষকে নাচাচ্ছে। ধর্মের নামে মানুষ লড়াই করছে বলেই ধর্ম জিনিসটা খারাপ, একথা বলা চলে না। ধর্ম জীবনের পক্ষে অপরিহার্য বলেই আপনি ওটাকে নিয়ে মানুষকে দিয়ে যা তা করাতে পারছেন। ধর্মের যদি কোথাও অসদ্ব্যবহার হয়ে তাকে, তা'হলে তার জন্য ধর্মকে দায়ী করা চলে না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও pure science দায়ী নয় অ্যাটমিক যুদ্ধের জন্য। দায়ী applied science, বিজ্ঞানকে যারা কাজে লাগিয়ে মানুষ মারছে, তারাই দায়ী। হিরোসীমায় মানুষ মরেছে বলে বিজ্ঞানের গবেষণাকে বন্ধ করে দিতে কেউ বলে না। pure science বলবে, আমি ত আপনাকে বলি নাই যে, হিরোসীমায় গিয়ে ধ্বংস করে আসেন। কোন জাতির দুর্বুদ্ধি এটা করেছে। ঠিক সেইরূপ ধর্মের অসদ্ব্যবহারের জন্য ধর্ম কখনই দায়ী হতে পারে না।

অনেক সময় হয়ে গেছে, এবারে কথা শেষ করি। পরকাল, ঈশ্বর, এসব ছেড়ে দিলাম। মানুষ শান্তিতে থাকতে চায় এবং শান্তিতে থাকার চেষ্টাই সবাই করছে। বিজ্ঞান এ শান্তি দিতে পেরেছে কি না এটাই আমাদের জিজ্ঞাসা। সামাজিক, রাষ্ট্রীয়—এসব কথাও তুলব না, জিজ্ঞাসা শুধু সত্যি সত্যি মানুষের জীবনে শান্তি এসেছে কি? কে বলবে, সমাজের মানুষ বলুক না কেন, বিজ্ঞানবিদেরা বলুন না কেন যে, এই দুই তিন শত বছরে মানবসমাজ ক্রমে কি শান্তির দিকে এগিয়ে চলেছে? জগতের লোক যদি বলে, আমরা বেশ শান্তিতে আছি, ধীরে ধীরে আরো কত শান্তি আসবে, ক্রমে শান্তিতে দেশ ভরে যাবে, যদি সবাই বুকে হাত দিয়ে সত্যই একথা বলে, তাহলে আমরা ধর্মের পুঁথিপত্র, ঈশ্বর, ভগবান, গীতা, ভাগবদ ইত্যাদি নিয়ে পাততাড়ি গুঁটিয়ে সরে পড়তে পারি। আমরা আছি, আমাদের একটাই কাজ-মানুষকে শান্তি দেবার চেষ্টা করা। আমাদের শাস্ত্রকারেরা মানুষকে শান্তি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই এত পুঁথিপত্র লিখেছেন। আমরা তাদের ভৃত্য মাত্র। আমরা তাদের অনুগামী, তাই ঘুরে বেড়াই। আমাদের লক্ষ্য মোটামুটি মানুষকে শান্তি দিতে চেষ্টা করা। আপনি যদি শান্তির ভালো ব্যবস্থা করে থাকেন তাহলে তো আর আমাদের কোন দরকার নেই, আমাদের

চলে যাওয়াই উচিত। আর আপনি যদি শান্তির ব্যবস্থা না করতে পেরে থাকেন তা'হলে, তোমরা সবে সরে পড়—একথা বলবার আপনার অধিকার নেই।

বুঝলেন না কথাটা? আপনি ডাক্তার, আপনি রোগীকে সুস্থ করতে পারেননি, আমি অন্য ডাক্তার ডেকেছি। এখন আপনি যদি বলেন, কেন মশাই, অন্য ডাক্তার ডাকতে গেলেন? একথা বলা কি আপনার উচিত? আপনি রোগ ধরতে পারেননি, অন্য ডাক্তার যদি dignose করতে পারে এবং তার ঔষধ ব্যবহার করে যদি রোগী আরোগ্য লাভ করে, তাতে আপনা আপত্তি করার কি আছে? আপনি রোগী ত ভালো করতে পারেননি, বরং রোগ আরও বাড়িয়েছেন। Typhoid-কে malaria মনে করে quinine চালিয়ে দিয়েছেন, এখন রোগীর অবস্থা সংকটাপন্ন। এখন উনি এসেছেন হোমিওপ্যাথির শিশি নিয়ে। আপনি বলবেন, ওই একফোঁটা ঔষধ তাও আবার ১৫ দিন পর পর—এতে কি কিছু হতে পারে? হোমিওপ্যাথ বলছেন, আমার অভিজ্ঞতা আছে, ১৫ দিন পর এক ফোঁটা দিয়েই আমি অনেক রোগী ভালো করেছি। আপনি তো আধ ঘন্টা পর পর ঔষধ খাইয়ে রোগীর দফারফা করেছেন। এখন দাঁড়িয়ে একটু দেখুন না আমার ঔষধের গুণ।

ঠিক তেমনি আপনি যদি বলেন—আপনার ও গীতা মন্ত্র পড়ে কি হবে? আমি বলব— গীতার মন্ত্র পড়েই ত মানুষকে শান্তি দিতে পেরেছি। এ শ্লোক শুনেই লক্ষ লক্ষ মানুষ শান্তি পেয়েছে। কাজেই, আপনার বলবার অধিকার নেই যে, মশাই, আপনি সরে পড়ুন। যুগ যুগ ধরে মানুষ এ পথে চলে যখন শান্তি পেয়েছে এবং এখনও পাচ্ছে, তখন আমাকে সরে পড়তে বলার আপনার কোন অধিকার নেই। আপনি বলবেন, ধর্ম নিয়ে ত আপনারা কেবল ঝগড়াঝাটি করেন। আমি বলব— আমরা ঝগড়া করি মারামারি করি তাতে আপনার কি? আপনাকে মেটাতে বলব না। কারণ আপনি ত ব্রহ্ম, আত্মা, ভগবান এসব কিছুই স্বীকার করেন না। রোগ নির্ণয় করার জন্য আমরা ডাক্তার ডেকেছি। তারা যদি রোগ নির্ণয় নিয়ে কথা কাটাকাটি করে, তা'হলে কি রোগি এসে বলবে যে, আপনারা চলে যান, আমি রোগ নির্ণয় করব? ডাক্তাররা রোগ নির্ণয় করতে পারছে না বলে কি উকিল এসে বলবে, আপনারা চলে যান, আমি রোগ নির্ণয় করব? সুতরাং ধর্ম নিয়ে যদি চৈতন্য, মহম্মদ, যিশু, বুদ্ধ এঁদের মধ্যে কোন অমিল থাকে, তাহলে সেটা তাঁরাই মেটাবেন, তাঁদের পুঁথি-পত্রই মেটাবে। ধর্ম নিয়ে যদি এঁদের চেলা-চামুণ্ডারা ঝগড়া করে, তাহলে আমরা বলব— কোরআন, গীতা, বাইবেল এসব মূল পুঁথিই এদের ঝগড়া মেটাবে। মূল পুঁথিতে সর্বত্রই এক কথা লেখা আছে। সেখানে ঝগড়ার অবকাশ নেই। সুতরাং ধর্ম যদি কোথাও দ্বন্দ্ব করে তবে সে দ্বন্দ্ব ধর্মই মেটাবে। আপনাদের laboratory-তে গিয়ে কি করবে? চিকিৎসকের ঝগড়া চিকিৎসকই মেটাবে, উকিল সেখানে এসে কি করবে? বিজ্ঞানের আওতার মধ্যে সত্য, ধর্ম, ঈশ্বর, আত্মা, পরমাত্মা, নীতি এসব কিছুই নেই, কাজেই এ নিয়ে তার কিছু বলবার অধিকারও নেই।

শান্তি যখন সে দিতে পারেনি এবং কোনো কালে যে দেবে তারও কোন লক্ষণ এবং যদি বুঝতাম যে মানুষ ধীরে ধীরে শান্তির দিকে এগিয়ে চলেছে, তাহলেও না তার একটা কথা বলার অধিকার স্বীকার করতাম। আমাদের field থেকে সরে পড়ে কি করব? আমরা যা দিচ্ছি, মানবের অন্তরাত্মা যে তাই চাচ্ছে। মানুষের ক্ষুধার্ত আত্মা হাহাকার করে বলছে— আমায় পরমাত্মার সন্ধান দিন। Man cannot live on bread alone, শুধু রুটিতে চলে না। শুধু ঘর-বাড়ি দালান-কোঠা, যান-বাহন, রাস্তা-ঘাট দিয়েই জীবন চলে না। জীবনের আর একটা বড় আকৃতি আছে, বড় দাবি আছে, একটা অসীমের অনুসন্ধান আছে। পরমাত্মার অনুসন্ধানে, ঈশ্বরের অনুসন্ধানের জন্য মানুষের ক্ষুধার্ত আত্মা যে কাঁদছে ক্ষুধার্ত মানুষ যে এসে হাহাকার করছে আমাদের দরজায়। কাজেই, আমাকে সরে পড়তে বলা অন্ততঃ ভদ্রতার খাতিরেও, আপনার সঙ্গত নয়। আমরা ত আপনাদের চলে যেতে বলি না। আমরা শুধু বলি আমাদেরও একটু জায়গা দিন এবং আপনারাও লক্ষ্য স্থির করে, মানবের কল্যাণটা, মঙ্গলটা ঠিক করে কাজে লাগুন। আপনারা যাবেন কেন? আপনারা কাজ করছেন, করুন, আমাদেরও জায়গা দিন, আমরাও কাজ করি। আপনারা কাজের মত কাজ করুন। একজন ভাঙ্গছে, একজন গড়ছে, আবার একজন এসে সব চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিচ্ছে—এমন ধারা প্ল্যান ছাড়া কাজ করছেন কেন? প্ল্যান করে, মানবের মঙ্গলের একটা সিদ্ধান্ত করে, কাজে লেগে যান। দু'-একটা সুস্থ রোগি দাঁড় করিয়ে দেখান। দেখান যে, বিজ্ঞানের পথে চলে এই মানুষগুলি খাঁটি মানুষ হয়েছে, মনুষ্যত্ব লাভ করেছে। দেখান যে, এরা সত্যি সত্যি মানুষ হয়েছে, এরা শান্তিতে আছে। এ ধরনের দু'একটা দৃষ্টান্ত স্থাপনও কম কথা নয়। আমাদের যদি জিজ্ঞেস করেন, আমরা নির্ভয়ে বলব—যুগ যুগ ধরে হাজার হাজার লোককে আমরা শান্তি দিয়েছি এবং এখনও দিতে পারি। এজন্যই দাঁড়িয়ে থাকার দাবি আমাদের কম নয়। ঐতিহ্য বিবেচনা করলেও অন্তত ১০ হাজার বছর ধরে পৃথিবীতে আমাদের পার্টি আছে এবং যত পার্টি আছে, তার মধ্যে আমাদের পার্টি সবচেয়ে পুরাতন, সবচেয়ে প্রাচীন। এত বড় একটা পুরাতন দলকে সরে পড়তে বললেই কি সে সহজে সরে পড়তে পারে? আমাদের পশার, আমাদের আসর, এত বড় যে তাকে তাড়াতাড়ি গুটিয়ে ফেলাও সম্ভব নয়। আমরা ত আর কুলিগিরি করছি না যে বলা মাত্রই মোট মাথায় করে উঠে পড়ব। আমরা বিশ্বের ভিতর মানবের কল্যাণ সাধনের জন্য হাজার হাজার insitution খুলে বসে আছি। অত সহজে আমরা গুটিয়ে ফেলতে পারি না। একটু চিন্তা করে আপনাদের এ কথাটা বলা উচিত। তিন শ' বছরের বিজ্ঞান এসে যদি হাজার হাজার বছরের ধর্মের অনুসন্ধান, ধর্মের সাধনা, ধর্মের তপস্যাকে সরে পড়তে বলে, তা'হলে একটা নিতান্ত নীচতা, ক্ষুদ্রতা নয় কি? Pure science কিন্তু একথা কখনও বলে না। যারা science-কে কাজে লাগিয়ে অসাধ্য সাধন করেছে বলে মনে করে, তারাই একথা বলে।

মোটামুটি আমাদের বক্তব্য হ'ল—ঈশ্বর আছেন এবং মানুষের জীবনের সাথে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্কও আছে। এখন এ সম্পর্ক যদি

আপনি অনুসন্ধান করে বের করতে না পারেন, ঈশ্বরের সঙ্গে আপনার সম্বন্ধ যদি আপনি নিকটতর করতে না পারেন, তাহলে আপনার মঙ্গলের কোনো আশা নেই। বিশ্বের বিরাটতম বস্তুকে অস্বীকার করে মানবের কল্যাণ সাধন করতে আপনি পারবেন না। ঈশ্বর-বিশ্বাস আপনারও প্রয়োজন। এই ঐতিহাসিক সত্যকে যদি আপনি স্বীকার না-ও করেন, তথাপি আপনাকে মানতে হবে। যেমন, অঙ্কশাস্ত্রে imaginary quantity $\sqrt{-1}$ ধরে অঙ্ক কষতে হয়। $\sqrt{-1}$-এর যদিও কোন বাস্তব সত্তা নেই, তথাপি একে না মানলে অঙ্কশাস্ত্র গড়ে উঠত না, calculus quantum mechanics-এ সব কিছুই হত না। অন্তত, এই $\sqrt{-1}$-এর মতই ঈশ্বর-সত্তাকে মানুষকে মানতে হবে। কারণ একে না মানলে মানব-জীবনের অঙ্কে গরমিল হবে, জীবন-সমস্যার যে equation তা solve করা যাবে না। তারপর যদি আপনার ক্ষমতা থাকে, অনুসন্ধান করুন। খবর পাবেন।

একটা ব্যক্তির, একটা সমাজের, একটা রাষ্ট্রের, একটা সমষ্টির যদি কল্যাণ সাধন করতে হয়, তাহলে একটা বৃহত্তম বস্তু, কল্যাণময় বস্তু, মঙ্গলময় বস্তু যে বিশ্বের মূলে, শুধু বিশ্বের মূলে নয়, প্রত্যেকের জীবনের মূলে আছেন, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তি-জীবনের, সমষ্টি-জীবনের যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে, সে সম্পর্কটা স্থাপন না করে তাঁকে স্বীকৃতি না দিলে শুধু mechanical বা বৈজ্ঞানিক উন্নতির সাহায্যে মানব সমাজের মঙ্গল সাধন করা সম্ভব নয়। আশা করি যেকথা বলতে বসেছিলাম, সেকথা মোটামুটি বলা হয়েছে। বিষয়টি আপনারাও গভীরভাবে চিন্তা করবেন। বর্তমান সমাজের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি অত্যন্ত মূল্যবান। হয়ত, অনেকেরই অনেক প্রশ্ন রয়ে গেছে। এ নিয়ে দু'চারদিন আলোচনা করলে আমাদের পক্ষের যতগুলো যুক্তি আছে, তা তুলে ধরা যেত। কেউ মনে করবেন না, হঠাৎ একটা যুক্তি দাঁড় করিয়ে বিষয়টি স্থাপন করার প্রয়াস পেয়েছি। বিপক্ষে আরও অনেক কথা বলবার আছে। কিন্তু আপনার সে বলার উত্তরও আমাদের কাছে আছে। অর্থাৎ আপনাদের খণ্ডনের খণ্ডনও আমাদের কাছে আছে। সুতরাং আলোচনাটি অত সহজে ছেড়ে দেবার মত নয়। সপক্ষে এবং বিপক্ষে অনেক কথা আরও বলার আছে। বাহাদুরি করার কিছু নেই একথা বলে যে, আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর-বিশ্বাস, ভগবানে বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা—এসব আসলেই মানবপ্রেম আসে, মানবে শ্রদ্ধা আসে এবং তা'হলেই Humanism–টা দাঁড়ায়। আর ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে, divinity-কে বাদ দিয়ে humanity–টা দাঁড়াতে পারে না। সুতরাং humanism ব্যর্থ হবে যদি ঈশ্বর-সত্তার স্বীকৃতি না থাকে।

সারা পৃথিবীর কথা বাদ দিয়ে বিশেষ করে আমাদের পাক-ভারতের কথাই বলি—এদেশের ধাতে এটা চলবে না। এক একটা মানুষের এক একটা ধাত থাকে। রোগিটার ধাত কি, বায়ুপ্রধান, পিত্তপ্রধান না কফপ্রধান—এটা আগে কবরেজ ঠিক করে নেয়; হোমিওপ্যাথরাও psora, sycosis না syphilis-এর ক্ষেত্রে এটা আগে ঠিক করে নেয়। অর্থাৎ রোগিটা কোন্ ধাতের, এটা ঠিক করে, তবে ঔষধের ব্যবস্থা করা হয়। পাক-ভারতের ধাত হল আধ্যাত্মিক ধাত। অন্য ধাতে তাকে চালালে ভাল চলবে না। আপনি যদি বলেন, অমুকে যদি পারে, তবে আমি কেন পারব না; অমুকে রৌদ্রে পুড়ে কাজ করে, আমি কেন পারব না? দেখুন না চেষ্টা করে। সর্দিকাশিতে জব্দ হয়ে পড়বেন। ঠিক যেমনি জড়বাদী বলে একটা ধাত আছে, ঈশ্বর অবিশ্বাস করে তারা কিছুকাল চলতে পারে, কিন্তু পরিণামে ধ্বংস অনিবার্য। কিন্তু এদেশের ধাত অন্যরূপ। এ ধাতে যদি আপনি ঈশ্বর অবিশ্বাস চালিয়ে দেন, তা'হলে অচিরে উপনিষদের ভাষায় "মহতী বিনষ্টি"। তা'হলে একটা গুরুতর ধ্বংস, একটা গুরুতর বিপর্যয় মানুষের সমাজে নেমে আসবে। আমরা সেই দুর্বিপাক যেন দেখতে পাচ্ছি।

আমরা optimist কিনা, তাই বলি—দেখেছেন না, বিরাট কুরুক্ষেত্রের ধ্বংসলীলার পরও আবার পাণ্ডবদের স্বর্গারোহণ। যত দুঃখ, যত অশান্তিই আসুক না কেন, শেষ পর্যন্ত স্বর্গারোহণ আছে, একটা কল্যাণ আছে, একটা শান্তি আছে। চরম পরিণতি পরাগতি লাভ—ইহা আর্যঋষির ধর্ম। এতে সর্বনাশ হতে পারে না, মঙ্গল আসবেই। এই মঙ্গলমুখী আমাদের চিত্তবৃত্তি হউক। আর্যঋষির বিরাট দান বেদ, উপনিষদ, গীতা, চণ্ডী, ভাগবত—এ দান যেন শ্রদ্ধার সঙ্গে মস্তক অবনত করে আমরা গ্রহণ করতে শিখি। আমাদের জাতির যে আধ্যাত্মিক ধাত, যে ধাতে তারা সহস্র সহস্র বছর ধরে সাধনা করে আসছে, আমরা যেন তা থেকে বিচ্যুত না হই।

"পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হতে সবে আনে উপহার—"

উপহার অনেক এনেছি, কিন্তু পরের পংক্তিটি একটু লক্ষ্য করতে হবে—

"দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে..."

বিশ্বের দরবারে আপনি কি দিতে পারেন? আপনার দেবার কি আছে? দেবার জিনিস একটিই আমাদের আছে—এই আধ্যাত্মিকতা, আত্মতত্ত্ব, আত্মোপলব্ধি, ঈশ্বরতত্ত্ব ইত্যাদি। পাশ্চাত্য দেশের মনীষীরাও একথা স্বীকার করেন। সারা পৃথিবী আজ বুভুক্ষু; সবাই আত্মার ক্ষুধায় কাতর। তাই তারা আমাদের দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে—এ তত্ত্ব অনুসন্ধানে, যাকে ইউরোপের পণ্ডিতরা বলেন— "Wisdom of the East. জড়বাদগ্রস্ত জাতি আজ যেন একটা বিরাট আগ্নেয়গিরির মুখে দাঁড়িয়ে হাহাকার করছে। তাদের কল্যাণ আনবার সঞ্জীবনী মন্ত্র এই জাতির বিরাট ঐতিহ্যের মধ্যে বিদ্যমান। সেই বিরাট, সেই মহান ঐতিহ্যের কথা যেন আমরা ভুলে না যাই। প্রভু বন্ধুসুন্দর আমাদের সহায় হউন। ❑

শ্রীশ্রী রামঠাকুর

অরুনাংশু হোর

শ্রীশ্রীঠাকুরের পিতৃদেব স্বর্গীয় রাধামাধব চক্রবর্ত্তী বিদ্যালঙ্কার একজন যোগসিদ্ধ মহাপুরুষ ছিলেন। তিনি পঞ্চবটিতে যোগাভ্যাস ও সাধন-ভজনে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন। এই পঞ্চবটিতেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেন। এই জন্যই পঞ্চবটি পুণ্যভূমি নামে খ্যাত।

শ্রীশ্রী রামঠাকুর একবার আসামের শিলচরে এক ভক্তের বাড়িতে গিয়েছিলেন। ঠাকুরের আশ্রিতা এক ভদ্র মহিলার চোখে গুরুদেবকে খুব শীর্ণকায় মনে হচ্ছিল। তাই তিনি ঠাকুরকে বললেন, "আপনার এ কি চেহারা হয়েছে? খাওয়া দাওয়া ঠিকমত করেনতো? এত অসুস্থ লাগছে কেন আপনাকে? ঠাকুর বললেন, হ, অন্যের উচ্ছিষ্ট খেয়ে খেয়ে আমাশা হয়ে গেছে আমার। মহিলা বললেন, সেকি আপনি উচ্ছিষ্ট খান কেন? কে আপনাকে উচ্ছিষ্ট দেয়? ঠাকুর বললেন, কী করুম, আপনারা যা দেন তাইতো খেতে হয়, না খেয়ে তো আর থাকতে পারি না। মহিলা বললেন, কই, আমি তো কখনো উচ্ছিষ্ট দিইনি আপনাকে? ঠাকুর বললেন, দেন না? স্বামী রসপুলি খেতে ভালোবাসে, তাই স্বামীর জন্যে রসপুলি বানিয়ে সেখান থেকে একটু আমাকেও দেন। স্বামীর উদ্দেশ্যে বানিয়ে অন্য কাউকে দিলে তা উচ্ছিষ্ট হয় না?

শুনে ভদ্র মহিলা ভীষণ লজ্জিত হয়ে নিকেজে অপরাধী বোধ করলেন। কারণ তিনি বাড়িতে প্রায়শ স্বামীর জন্যে রসপুলি তৈরি করেন আর সেখান থেকে আলাদা বাটিতে তুলে ঠাকুরকে ভোগ দিতেন পুজোর সময়। কারু উদ্দেশ্যে কিছু রান্না করে সেখান থেকে পুজোর ভোগ দিলে তা উচ্ছিষ্ট হয়, সেটা তার জানা ছিল না। তিনি ভাবলেন, সত্যিইতো ঠাকুরকে ভালোবেসে তিনি কখনো রসপুলি বানাননি। নিজেকে অপরাধী মনে করে তিনি বারবার ঠাকুরের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে থাকেন।

একদিন ঠাকুর পঞ্জিকার পৃষ্ঠা উল্টোতে উল্টোতে দেখেন, বাতের অমোঘ ওষুধ বলে এক বিক্রেতা একটা বিজ্ঞাপন দিয়েছে। অশেষ গুণের কথা বলে শেষে লিখেছিলেন, 'ওষুধ ব্যবহারে ফল না হলে দাম ফেরত দেয়া হবে'। ঠাকুর তখন বাতের ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। আর তাই তাঁর নির্দেশমত ঔষুধ আনা হল, লাগানোও হল। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হল না। ব্যথা যে কে সেই রয়ে গেল। ঠাকুর বললেন, "ওষুধে যখন ফল হল না, বিজ্ঞাপন অনুযায়ী দাম ফেরত দেয়া উচিত"। পাশে বসা এক ভক্তকে তখন তিনি বললেন, "যান, এবার টাকাটা ফেরত নিয়ে আসেন গিয়ে"। কিছুক্ষণ পরে ভক্ত ফিরে আসামাত্র ঠাকুর জিজ্ঞেস করলেন, "টাকাটা ফেরত পেলেন?"...না ওরা টাকা ফেরত দেয়নি।... কেন? বিজ্ঞাপনে ত ঐরকমই কথা আছে।... ওরা বললো, চিঠি দিয়ে জানাবে।

সত্যি সত্যিই সেই বহু প্রত্যাশিত পত্র যখন এল, ঠাকুর ব্যস্ত হয়ে চোখে চশমা দিয়ে সেই চিঠি পড়তে লাগলেন। সেখানে উপস্থিত ভক্তবৃন্দ আগেই সেই চিঠি পড়ে নিয়েছিলেন, তাই তারা মুচকি মুচকি হাসছিলেন। শ্রীশ্রীঠাকুর পড়লেন, "আমাদের ওষুধ শুধু মানুষের জন্যে, ভগবানের জন্যে নয়"। ঠাকুর বললেন, মানুষ ঠকাবার বুদ্ধি।

আর একবার একজন মহিলা ভক্ত ঠাকুরকে প্রশ্ন করেছিলেন, "বাবা, রোজ রোজ ইচ্ছে থাকলেও আপনার পুজো-ভোগ দিতে পারি না।" ঠাকুর বললেন, "ক্যান? যেইদিন ভোগ দিতে পারেন না, সেই দিন কি আপনি নিজেকে আর অন্যদের খেতে দেন না? যদি দিয়ে থাকেন, তবে আমাকে কেন দিতে পারবেন না? আমাকে দিতে এত দ্বিধা কেন? আমাকে কি আপনাদের একজন ভাবতে পারেন না? সব সময় মনে রাখবেন, আমার একজন আপনজন আছেন।" এই শুনে ওই মহিলার চোখ জলে ভরে উঠেছিল।

উত্তরে চাষী বললেন, গুনাহ হবে কেন কর্তা? তিনি তো হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। একটা অনেক উঁচু টিলার উপর বসলে যেমন নিচের সবই সমান দেখা যায়, ঠাকুরও যে ঐরকম একটা টিলায় বসে আছেন, আর তাই তিনি সবাইকে সমান দেখেন"।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের অন্য একজন ভক্ত শ্রী উপেন্দ্রকুমার সাহা চৌমুহনীতে প্রতি বছর অতি সমারোহে ঠাকুরের ঝুলন উৎসব করতেন। এরকম এক ঝুলন উৎসবে দিনের বেলায় মহোৎসব হচ্ছে। উৎসব প্রাঙ্গণ লোকে লোকারণ্য। বর্ষাকাল, ভোগের পর হাজার খানেক লোক মুক্ত প্রাঙ্গণে বসে প্রসাদ গ্রহণ করছিলেন। এমন সময় চারদিক অন্ধকার করে বৃষ্টি পড়তে শুরু করল। উপেনবাবু তাই অস্থির হয়ে অন্য এক ভক্তকে জিজ্ঞেস করলেন, "দাদা, কি হবে এখন?" তিনি বললেন, "ঠাকুরকে ডাকুন, আর কোন উপায় নেই"। ভক্তের ডাকে ঠাকুর সাড়া না দিয়ে পারেননি। অবাক হয়ে তখন সবাই দেখলেন, উপেনবাবুর বাড়ির চারপাশে মুষলধারায় বৃষ্টি হচ্ছে, কিন্তু তাঁর বাড়ির সামনের মুক্ত প্রাঙ্গণে এক ফোঁটাও জল পড়ছে না। জীবনের এই দৃশ্য দেখার সৌভাগ্য সেখানে উপস্থিত অনেকেরই হয়েছিল। ঠাকুরের কি মহিমা। সবাই তখন চোখের জলে বার বার শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে প্রণাম জানালেন।

শ্রীশ্রীঠাকুরের এক ভক্ত (নলিনীবাবু) ঠাকুরের একটি ফটো তোলার জন্য একজন ফটোগ্রাফার এনে ঠাকুরকে কাপড়-জামা ও চাদর পরিয়ে একটি দোলায় বসালেন। ফটোগ্রাফার ক্যামেরা ঠিক করার পর নলিনীবাবু ফটোগ্রাফারকে বললেন, "আপনি ঠাকুরের কাছে ফটো তোলার অনুমতি নিন"। ফটোগ্রাফার সেটা গ্রাহ্য না করেই

পর পর দুটো 'স্ন্যাপ' নিয়ে সন্তুষ্ট মনে বললেন, "খুব ভাল ফটো উঠেছে, আমি সকালেই আপনাকে ছবির কপি দিয়ে দেব"। পরদিন বিষণ্ণ বদনে ঐ ফটোগ্রাফার ক্যামেরা নিয়ে আবার হাজির। বললেন, "একটা ফটোও উঠেনি, অদ্ভুত ব্যাপার!" নলিনীবাবু তখন বললেন, "আপনাকে ঠাকুরের অনুমতি নিতে বলেছিলাম, আপনি গ্রাহ্য করেন নি"। অনুমতি না নিয়ে আজ অব্দি কেউ গুরুদেবের ছবি তুলতে পারেনি।" নলিনীবাবু আবার ঠাকুরকে সাজিয়ে একটা দোলায় বসিয়ে ফটোগ্রাফারকে ঠাকুরের অনুমতি নিতে বললেন। এবারে ফটোগ্রাফার ঠাকুরকে প্রণামান্তে পা ছুঁয়ে অনুমতি প্রার্থনা করলেন। ঠাকুর বললেন, "তোলেন"। সেবার ফটো তোলা খুব ভাল হল।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একটু পেটরোগা ছিলেন। একদিন তিনি ডাঃ যতীন্দ্র মোহন দাশগুপ্তের ৮৭, বালিগঞ্জ প্লেসের বাড়িতে (বাড়ির নাম রেখেছিলেন রাম-নিবাস) শ্রীশ্রীঠাকুরের চরণে নিবেদিত ভোগ শেষে প্রসাদ নেওয়ার জন্যে বারবার অনুরোধ জানালে ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁকে বললেন, "দাদা আজ যা প্রসাদ হয়েছে তা কিন্তু আপনার পেটের পক্ষে মোটেই উপকারী নয়, কিন্তু তিনি নাছোড়বান্দা। এমন সময় সেখানে শ্রীশ্রীরামঠাকুর উপস্থিত হলেন। জানতে চাইলেন কি নিয়ে দুজনের মধ্যে বাকযুদ্ধ চলছে। উত্তরে ডাঃ দাশগুপ্ত তাঁর কথা বললেন আর শরৎচন্দ্র শোনালেন তাঁর বক্তব্য। দুজনের কথা শুনে শ্রীশ্রীঠাকুর বললেন, "বৈষ্ণব ঠাকুরকে প্রসাদে কেন বাঞ্চনা করবেন? উনিতো উপকরণ খাইবেন না, প্রসাদ খাইবেন, প্রসাদে কোন দোষ থাকে না।" পরে শরৎচন্দ্র বলেছিলেন, "বড় ভাল প্রসাদ হয়েছে, আকণ্ঠ খেয়েছি"। তারপর উদাসকণ্ঠে বলেছিলেন, "ঠাকুরের কাছে যখনই এসেছি, মনে হয়েছে সব পেয়েছির দেশে বাস করছি। দূরে গেলে আবার সেই সুর হারিয়ে ফেলি। হারান সে-সুর আর খুঁজে পাই না।" ঠাকুর দুর্জ্ঞেয় কিন্তু আকর্ষণ তাঁর দুর্বার। তাই বার বার বসি আর উঠি। আমি ঠাকুরের কথা শুনতে চাই, বুঝতে চাই, তাঁকে বারবার দেখতে চাই।"

শ্রীশ্রীঠাকুরের একবার কয়েকদিনের জন্য ঝোঁক হয়েছিল, তিনি ধূমপান করবেন। প্রবল উৎসাহে একটার পর একটা সিগারেট ধরাচ্ছেন আর ধোঁয়া ছাড়ছেন। ভক্তরা সবাই অবাক। এসব নেশা করতে তাঁকে কখনো দেখা যায়নি। কি উদ্দেশ্যে এই খেয়ালিপনা, এই সিগারেট লীলা– সেটা কে বলবে? যাই হোক, মুহুর্মুহু ধূম উদগীরণ চলছে, এমন সময় হঠাৎ সেখানে এক অপরিচিত সাধু এসে উপস্থিত। তাঁকে দেখে ঠাকুর অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন। জ্বলন্ত সিগারেটটা নিভিয়ে এক পাশে তিনি লুকিয়ে রেখে ভক্তিভরে ভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে সাধুকে প্রণাম করলেন। তাঁর ইঙ্গিতে কয়েকজন ভক্ত এরমধ্যে ওই সাধুকে কিছু প্রণামীও দিলেন। সবাই ভাবছিলেন ঠাকুর যাকে এত শ্রদ্ধা দেখাচ্ছেন তিনি নিশ্চয়ই কোন উচ্চ স্তরের সাধক। যাই হোক, সাধু প্রস্থান করামাত্র ভক্তরা সবাই মিলে প্রশ্ন করলেন, "ঠাকুর, ইনি কোন্ মহাত্মা? উনাকে দেখে আপনি এতো লজ্জা পেয়ে সিগারেট লুকিয়ে ফেললেন?" সকলের কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসার যবনিকা টেনে ঠাকুর নির্বিকারভাবে বললেন, "আসলে উনাকে আমিও এই প্রথম বার দেখলাম।" এই শুনে ভক্তরা সবাই হেসে কুটি কুটি হয়ে পড়লেন। সবাই বলাবলি করতে লাগলেন, "দ্যাখো ঠাকুরের কাণ্ড! কোথাকার কোন অজানা সাধুকে আজ নিজের অভিভাবক করে ফেলেছিলেন"। ভক্তরা একটু শান্ত হলে ধীরে গম্ভীর কণ্ঠে ঠাকুর বলেছিলেন, "সর্বদা জেনে রাখবেন, গেরুয়া বসন হচ্ছে ত্যাগের প্রতীক, সন্ন্যাসীর ভূষণ, তাকে সম্মান করতে হয়। দেখেছেন তো সেনাপতির পোশাকটি নজরে পড়া মাত্র সব সৈন্যরা কুর্নিশ দেয়, পোশাকটা কে পরেছে তা নিয়ে কেউ কখনো মাথা ঘামায় না"। ঠাকুরের কথা শুনে শ্রদ্ধা ও মর্যাদা দানের এই উদার নীতি ও মনোভাবের কথা ভক্তরা তখন নতুন করে ভাবতে শুরু করেছিলেন।

শ্রীশ্রী ঠাকুরের জন্মভূমি ডিঙ্গামানিকে ভক্তগণ একবার তাঁর জন্মোৎসব পালন করছিলেন, হরিনাম আর মৃদঙ্গ-করতালের ঝঙ্কারে সারা গ্রাম তখন মুখর হয়ে উঠেছিল। ঠাকুরের ভক্ত ডক্টর ইন্দুভূষণ ও আরও কয়েকজন মিলে তখন বাড়ির বাইরে বসে কিছু একটা আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ উপস্থিত সবার দৃষ্টি পড়ল অদূরে গাছের ছায়ায় বসা এক মুসলমান চাষীর ওপর। হাতে একটা পুঁটলি নিয়ে চুপচাপ আপন মনে তিনি বসেছিলেন। প্রশ্ন করে জানা গেল, পুঁটলিতে তিনি সযত্নে নিয়ে এসেছেন কয়েকটা আম, কলা আর সামান্য কিছু চাল। ঠাকুরকে তিনি এগুলো নিবেদন করতে চান। ইন্দুবাবু তখন তাড়াতাড়ি জিনিসগুলো ঠাকুরের ভোগের জন্য দিয়ে আসলেন। তারপর সেই দরিদ্র নিরক্ষর চাষীর সাথে শুরু করলেন গল্পগুজব। ইন্দুবাবু প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা মিয়া ভাই, ঠাকুরকে তো এতদিন ধরে তুমি দেখে আসছ। কিন্তু বুঝলে কি?" উত্তরে সে চাষী বলেছিলেন, "কর্তা, এসব মানুষ আসে একটা ঝিলিকের মত। আবার ঝিলিকের মত চইলা যায়। কারুর কিছু বোঝবার যো নাই"–সহজ সরল তার উত্তর। ইন্দুবাবু বললেন, যদি কিছু না-ই বুঝে থাক, তবে ঠাকুরের কাছে এত আস যাও কেন? তাঁকে দেখার জন্য এত ব্যস্তই বা হও কেন? চাষী বললেন, "তাঁকে দেখতে ভালো লাগে, কথা শুনতে ভালো লাগে, তাই বার বার আসতে ইচ্ছে করে"। ইন্দুবাবু বললেন, "এই যে তুমি তাঁর ভোগের জন্য চাল, কলা, আর আম নিয়ে এসেছ, তোমার গুনাহ হবে না? মৌলভী সাহেবরা গালাগাল দেবে না?" উত্তরে চাষী বললেন, গুনাহ হবে কেন কর্তা? তিনি তো হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। একটা অনেক উঁচু টিলার উপর বসলে যেমন নিচের সবই সমান দেখা যায়, ঠাকুরও যে ঐরকম একটা টিলায় বসে আছেন, আর তাই তিনি সবাইকে সমান দেখেন"। এই শুনে ইন্দুবাবু সহ উপস্থিত সবাই অবাক। তারা ভাবলেন ঠাকুরের কৃপায়

এই নিরক্ষর চাষীর মধ্যে যে বোধের সূচনা হয়েছে সেটা ক'জন শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ভক্তের মধ্যে আছে?

শ্রীশ্রীকৈবল্যনাথ সম্পর্কে বলে বা লিখে শেষ করা যাবে না। একবার শ্রীশ্রীঠাকুর কলকাতায় জনৈক ভক্তের বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন। এই সময়ে কয়েকজন পতিতা (?) ঠাকুরকে দেখতে ও তাঁর পায়ের ধুলো নিতে সেই বাড়ির দরজায় এসে উপস্থিত। কিন্তু পতিতা বলে গৃহকর্তা তাদের ঠাকুরের কাছে যেতে দিচ্ছিলেন না। এতে তারা মনে খুব কষ্ট পেয়েছিলেন। কাকুতিমিনতি করে তারা দরজা ছেড়ে দিতে অনেক অনুরোধ করলেন। কিন্তু ফল কিছু হল না। তখন সেখানে ঠাকুরের ভক্ত অবনীকান্ত মুখোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি পতিতাদের ব্যগ্রতা দেখে গৃহকর্তাকে দরজা ছেড়ে দিতে অনুরোধ করলেন। গৃহস্বামী তখন ঠাকুরের কাছে গিয়ে ঐ পতিতাদের আসার কথা খুলে বললেন। ঠাকুর তখন বললেন, "আমি ত চোখে দেখি না, ছোট-বড়, পতিতা-অপতিতা, সাধু-অসাধু কিছুই না, তারা যখন আসতে চান, তখন তাদের আসতে দিতে আপত্তি কেন?" এই শুনে গৃহকর্তার হুঁশ হল। অবনীবাবু ঠাকুরের কথা শুনে তখন কেঁদে ফেলেছিলেন। তিনি তখন সেই রমণীদের ঠাকুরের কাছে নিয়ে আসলেন। গৃহস্বামীর কিন্তু তখনও অভিমান দূর হয়নি। তিনি সেই পতিতাদের দূর থেকে প্রণাম করতে বললেন। অগত্যা তারা তাই করলেন। তাদের কেউ কেউ সাথে করে ফুল এনেছিলেন ঠাকুরের পায়ে দিতে। দূর থেকে সেই ফুল তারা ঠাকুরের নামে তাঁর পায়ের দিকে ছুড়ে দিয়েছিলেন। ঠাকুর তাদের ছোড়া সব ফুল কুড়িয়ে তাদের মাথায় ছোঁয়ালেন এবং মাথায় হাত রেখে তাদের সবাইকে আশীর্বাদ করলেন। অবনীবাবু পরে তাঁর বাড়িতে এসে কাঁদতে কাঁদতে বলেছিলেন, "হায়! আমরা এত বড় হতভাগ্য যে, এমন প্রেমময় ঠাকুরকে আজ অব্দি চিনতে পারলাম না, এখনও সেই ছোট্ট গোষ্পদে পড়েই আছি, কখন এই অসীম মহাসাগরকে জানতে পরব, কে জানে?"

তন্ত্র, মন্ত্র, বেদ, উপনিষদ, সাংখ্য, দর্শন, জ্যোতিষ গণনা, ডাক্তারি, কবিরাজি প্রভৃতি সব শাস্ত্রেই শ্রীশ্রী ঠাকুরের সমান অধিকার ছিল। ভারতের প্রচলিত ভাষার প্রায় সবগুলো তাঁর জানা ছিল। তাঁর মুখনিঃসৃত গীতার ব্যাখ্যা বাজারে প্রকাশিত কোন ভাষ্যে পাওয়া যায় না। যারা সৌভাগ্যক্রমে তাঁর মুখে গীতার ব্যাখ্যা শুনেছেন, তাঁরাই মুগ্ধ হয়ে বলতেন, এমন ব্যাখ্যা আগে কখনো শোনেননি। তাঁর কাছে জাতিভেদ ছিল না। হিন্দু, মুসলমান, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, সবাইকে তিনি বলতেন মানব জাতি। আর তাই সবাইকে তিনি কোল দিয়েছিলেন। ❑

অধ্যাপক, সেন্টেনিয়াল কলেজ, টরন্টো।

(ঋগ্বেদের মাহাত্ম্য– ১৭ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

বৈদিক যুগে সমাজে নারীর স্থান,

"যত্রঃ পূজ্যন্তে নারী, রম্যন্তে তত্রঃ দেবতাঃ"।

অর্থাৎ যেখানে নারীর পূজা হয়, দেবতা সেখানে বিরাজ করেন। উন্নত সমাজের একটা লক্ষণ হল যে সেখানে নারীর খুব মর্যাদার আসন থাকে। সেই হিসেবে বৈদিক সমাজ খুব উন্নত ছিল, কারণ সেখানে নারীর খুব সম্মান ছিল, এর সপক্ষে ঋগ্বেদের অনেক শ্লোকের উল্লেখ করা যায়।

(১) নারী এবং পুরুষের একত্রে যজ্ঞ সম্পাদনের অধিকার– ঋগ্বেদের একটি শ্লোকের অর্থ– "হে দেবগণ, যে দম্পতি এক মনে সোম শোধন করে এবং মিশ্রণ দ্রব্য দ্বারা সোম মিশ্রিত করে তারা ভোজন যোগ্য অন্নাদি লাভ করে এবং মিলিত হয়ে যজ্ঞে উপস্থিত হয়, তারা অন্নার্থে কোথাও যায় না।

(২) বিধবা বিবাহ– বৈদিক যুগে সম্ভবত বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল, যেটা একটি শ্লোকের বঙ্গানুবাদ পড়লে বোঝা যায়। যেখানে বলা হয়েছে– এ সকল নারী বৈধব্য দুঃখ অনুভব না করেও ঘৃতের সাথে গৃহে প্রবেশ করুন। এ সকল বধূ অশ্রুপাত না করে, রোগে কাতর না হয়ে উত্তম উত্তম রত্ন ধারণ করে সর্বাগ্রে গৃহে আসুন।

(৩) পিতৃ সম্পত্তিতে অবিবাহিত কন্যার অধিকার–এর প্রমাণ আমরা ঋগ্বেদের শ্লোক থেকে পাই যার বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়– যাবজ্জীবন পিতামাতার সাথে অবস্থিতা দুহিতা যেমন আপনার পিতৃকুল হতেই ভাগ প্রার্থনা করে।

(৪) যুদ্ধে মহিলা সারথি– পুরুষদের সাথে মহিলারাও যুদ্ধে অংশ নিতে পারতেন। যেখানে শ্লোক বলছে– মুদগলের পত্নী যখন রথারূঢ় হয়ে সহস্রজয়িণী হলেন।

বৈদিক যুগে বর্ণ বিভাগ ছিল, কিন্তু সেটা কর্ম অনুসারে, জন্ম অনুসারে না। শ্লোকের বঙ্গানুবাদ বলছে– "দেখ আমি স্তোত্রকার, পুত্র চিকিৎসক ও কন্যা প্রস্তরের উপর যব-ভর্জনকারিণী। আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন কর্ম করছি"।

ঋগ্বেদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে বলা হয়েছে– "এর মুখ ব্রাহ্মণ হল, দু-বাহু রাজন্য হল, যা উরু ছিল তা বৈশ্য হল, দু চরণ শূদ্র হল"। অর্থাৎ বিদ্যা চর্চা করত বলে ব্রাহ্মণের উৎপত্তি মুখ থেকে, বলবান বিধায় বাহু হতে ক্ষত্রিয়ের উৎপত্তি (বলের প্রকাশ বাহুতে), ভ্রাম্যমাণ বলে উরু হতে বৈশ্যের উৎপত্তি (ঘুরে ঘুরে ব্যবসা করতে হয়) এবং সবার সেবা করায় চরণ হতে শূদ্রের উৎপত্তি (পায়ের উপর বাকি শরীর অবস্থান করে)। এখানে কর্মক্ষমতা বা গুণের ভিত্তিতে বর্ণ বিভাগ নির্দেশিত, জন্মানুসারে নয়।

সুষ্ঠুভাবে সমাজ পরিচালনার জন্য ঋগ্বেদে অনেক নির্দেশ ছিল, যেমন– যে ধনবান লোক পরকে প্রতিপালন করে না, তাকেও ঘৃণা করি।

আরও অনেক জ্ঞানের কথা ঋগ্বেদে আছে যেমন– (ক) সূর্যের আলো চন্দ্রে প্রতিফলিত হয়, (খ) লৌহ কুঠারের ব্যবহার, (গ) কৃষি কার্যের বর্ণনা। ❑

ভূতপূর্ব অধ্যক্ষ, পোস্ট গ্রাজুয়েট কলেজ, রাজস্থান, ভারত।

বৈষ্ণব

মৈত্রেয়ী চৌধুরী

চৈতন্যদেবের দিক্‌পাল পার্ষদবৃন্দের প্রায় সকলেই ছিলেন অসাধারণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদরাই তাঁর অস্ত্রস্বরূপ। অনুগামী ভক্তগোষ্ঠীর সংগঠনে শ্রীচৈতন্যের প্রত্যক্ষ সক্রিয় ভূমিকা না থাকলেও তাঁর সন্ন্যাসধর্মের কঠোরতা, নিষ্ঠা এবং আদর্শ ভাগবত জীবন—অন্তরঙ্গ পার্ষদ এবং ভক্তদের অনুপ্রাণিত করত পারমার্থিক কল্যাণের পথে।

নববৈষ্ণববাদ আন্দোলনের প্রসারণে চৈতন্যভক্তগণের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অনস্বীকার্য। পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবনভেদে চৈতন্যভক্তদের মূলত দুটি পরিমণ্ডল। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সমাজের আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব ধীরে ধীরে গৌড়ভূমি ছেড়ে ব্রজভূমির দিকে যাত্রা করে।

শ্রীচৈতন্যের প্রকটলীলায় বাঙালি বৈষ্ণবের কাছে চৈতন্যদেবের অবস্থানভূমি পুরুষোত্তম-ধাম শ্রীক্ষেত্র বা নীলাচল (পুরী) ছিল পরমতীর্থস্বরূপ। তাঁর অপ্রকটলীলায় শ্রীপাদ নিত্যানন্দ এবং অদ্বৈতাচার্য বৈষ্ণবসমাজের নেতৃত্বের ধারক রূপে সম্মানিত ছিলেন।

প্রেমতীর্থ প্রাচীন বৃন্দাবনধামে বৈষ্ণব সাধনপীঠ প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করেছিলেন চৈতন্যদেবের পরমগুরু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র পুরী। সে পুণ্যপীঠের ভিত্তি স্থাপনে উদ্যোগী ছিলেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। অসামান্য প্রাকৃতিক পরিবেশে নির্জন পবিত্র স্থানটি বিবিক্তসেবী ভক্ত সাধকের তপোভূমিরূপে নির্ধারণ করেছিলেন মাধবেন্দ্রপুরীর প্রশিষ্য শ্রীচৈতন্য। বৃন্দাবনের লুপ্ততীর্থ উদ্ধার এবং শাস্ত্রগ্রন্থ লিখবার জন্য দুই ভাই রূপ গোস্বামী এবং সনাতন গোস্বামীকে চৈতন্যদেব স্থায়িভাবে বৃন্দাবনবাসের উপদেশ দেন।

বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপ উভয় গোষ্ঠীর ভক্তবৃন্দের লক্ষ্য ছিল চৈতন্যধর্মের প্রচার। চৈতন্যদেব যে প্রেম ভক্তিমূলক ধর্মপ্রচার করেছিলেন সে ধর্মে কোনো সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামির ঠাঁই ছিল না। কৃষ্ণোপাসক মহাপ্রভুর সাধনায় শ্রীরাধার ভাবমূর্তির অভিব্যক্তি।

শ্রীচৈতন্যের দিব্যজীবন ছিল ঈশ্বরভক্তির মানদণ্ড। অন্যান্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রবর্তক বা প্রতিষ্ঠাতাদের মত চৈতন্যদেব তাঁর চিন্তা, ভাবনা বা বিশ্বাসের লিখিত রূপ দিয়ে যাননি— কাগজে কলমে রেখে যাননি কোনো সিদ্ধান্তের স্বাক্ষর। চৈতন্যদেবের ধর্মান্দোলনের তত্ত্বমূলক দিকটি সম্প্রসারণ সুসম্পন্ন হয় বৃন্দাবনের ভক্তমণ্ডলীর সক্রিয় সাহচর্যে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের ধর্মতত্ত্ব, দর্শন এবং রসশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থসংকলনের মূলে বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী। এঁরা সংস্কৃত ভাষার মাধ্যমে সারা ভারতে গৌড়ীয় বৈষ্ণববাদের প্রচার করেন। চৈতন্যধর্মের মৌলিক তত্ত্বগুলির ব্যাখ্যা এবং নীতিতত্ত্বগুলি নির্ধারণ করতেন বৃন্দাবনের ভক্তগণ। শ্রীচৈতন্যের ধর্মতত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং আচার প্রণালিগুলি সুসম্বন্ধ করার দায়িত্ব তাঁরা পালন করতেন ঐকান্তিকভাবে।

মহাপ্রভুর দেহাবসানের পর বাংলার বৈষ্ণবধর্ম এবং বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর ধর্মের তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। ব্রজভূমির বৈষ্ণব পরিমণ্ডলে বৃন্দাবনের ভক্তবৃন্দ চৈতন্যদেবকে রাধাকৃষ্ণ মিলিত বিগ্রহস্বরূপ একটি বিশেষ তত্ত্বরূপে গড়ে তুলেছিলেন। 'অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর' সেই তত্ত্বের তাৎপর্য। কৃষ্ণতত্ত্ব সামনে রেখে তাঁরা চৈতন্যধর্ম প্রচার করেন। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের দৃষ্টিতে রাধাকৃষ্ণ—সমন্বিত স্বরূপ চৈতন্যদেব ভক্তিমার্গে উদ্দেশ্যসাধনের উপায়।

গৌড়ীয় ভক্তগণের দৃষ্টিতে চৈতন্যদেব প্রকাশিত হয়েছিলেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন ভগবান শ্রীকৃষ্ণস্বরূপে। নবদ্বীপের বৈষ্ণববাদীদের মতে চৈতন্যদেব ছিলেন স্বয়ং সাধ্যস্বরূপ পরতত্ত্ব। বাংলার এবং বৃন্দাবনে চৈতন্য ভক্তমণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্যই স্বতন্ত্র শাখাসৃষ্টির উৎস। তবে বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামী সংশয়াতীত রূপে ছিলেন বাংলার বৈষ্ণবমণ্ডলীর ধর্মযাজক স্বরূপ। বঙ্গদেশে রচিত সিংহভাগ গ্রন্থই বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অনুমোদনের জন্য প্রেরণ করা হ'তো শ্রীধাম বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের অনুমোদন না পেলে গ্রন্থগুলি বৈষ্ণব কর্তৃপক্ষ দ্বারা গৃহীত হ'তো না।

বৃন্দাবন এবং নবদ্বীপ উভয় গোষ্ঠীর ভক্তবৃন্দের লক্ষ্য ছিল চৈতন্যধর্মের প্রচার। চৈতন্যদেব যে প্রেম ভক্তিমূলক ধর্মপ্রচার করেছিলেন সে ধর্মে কোনো সংকীর্ণতা বা গোঁড়ামির ঠাঁই ছিল না। কৃষ্ণোপাসক মহাপ্রভুর সাধনায় শ্রীরাধার ভাবমূর্তির অভিব্যক্তি। তাঁর ধর্মে কোনো সাম্প্রদায়িকতা ছিল না।

পরিব্রাজনকালে ভারতপথিক শ্রীচৈতন্য সকল তীর্থেই করেছেন দেবদর্শন। ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থে বিষ্ণু, শিব, শক্তি, কার্তিক, গণেশ প্রমুখ দেবতাকে তিনি দর্শন ও প্রণাম করেছেন ভক্তিভরে। তাঁর ধর্মাচরণের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও মূলমন্ত্র ছিল কৃষ্ণনাম সংকীর্তন।

চৈতন্যদেব বৈষ্ণবধর্মের কোন্ শাখার অনুবর্তী এই প্রসঙ্গে বিদিত তথ্যানুসারে তাঁর দীক্ষাগুরু ঈশ্বরপুরী এবং সন্ন্যাসগুরু কেশবভারতী উভয়ই ছিলেন শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর মন্ত্রশিষ্য। মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন মাধব সম্প্রদায়ভুক্ত। ব্রহ্ম, রুদ্র, শ্রী এবং সনক প্রভৃতি চারটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ব্রহ্মসম্প্রদায়ের আদিপুরুষ ছিলেন মাধবাচার্য। কোনো কোনো প্রাজ্ঞ পণ্ডিতের মতে মাধবাচার্য ছিলেন পাঞ্চরাত্র এবং ভাগবতের অনুবর্তী।

মহাপ্রভু স্বয়ং কোনো সম্প্রদায় সৃষ্টি করেননি। মুরারি গুপ্ত, বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস, জয়ানন্দ প্রমুখ মহাপ্রভুর জীবনীকাররাও তাঁর প্রতিষ্ঠিত কোনো সম্প্রদায়ের উল্লেখ করেননি। ব্যতিক্রম কিন্তু বৃন্দাবনের গোস্বামীবৃন্দ। চৈতন্য প্রবর্তিত মতবাদ এবং চৈতন্যতত্ত্বের ব্যাখ্যা করেছেন তাঁরাই। পাঞ্চরাত্র এবং ভাগবতের সামঞ্জস্যের মাধ্যমে ভক্তিতত্ত্বের অভিনব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়। আচার্য ক্ষিতিমোহন সেনের অভিমত হলো, মাধবমতের একটি স্রোত বাংলাদেশে পৌঁছে মহাপ্রভুকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। সাহিত্যরত্ন শ্রদ্ধেয় হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়কে শ্রীচৈতন্য সম্প্রদায় বা শ্রীমাধবেন্দ্র সম্প্রদায় বলাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেছেন। ❑

'প্রসঙ্গ শ্রীচৈতন্যদেব' থেকে সংগৃহীত।

গুরু-শিষ্য পরম্পরা

ননীগোপাল দেবনাথ

আমাদের গ্রামে একটি সংঘ ছিল, নাম ছিল গীতাসংঘ। আমি তখন স্কুলে পড়ি, আমার বাবা সেই সংঘের উদ্যোক্তা এবং সদস্য ছিলেন, দেখিয়াছি সংঘের কর্মকাণ্ড, সদস্যদের বাড়ি বাড়ি নির্দিষ্ট দিনে সবাই মিলে ছন্দ সুর তুলিয়া গীতাপাঠ হইত, বুঝিতাম না কিছুই, তবে পাঠের পরে একটি অধ্যায় নিয়া আলোচনা হইত। তাহা ভালই বুঝা যাইত এবং আমাদের বাড়িতে যেই দিন গীতাপাঠ হইত, সেইদিন একটি উৎসব মনে হইত, সব সদস্য ধুতি, সাদা জামা বা পাঞ্জাবি পরিয়া গীতা হাতে উঠানে পাতা আসনে আসিয়া বসিতেন তারপর সবাই আসার পর পাঠ শুরু হইত। বাড়ির পরিবেশ সেইদিন কেন যেন পবিত্র মনে হইত, সকলের ভাবমূর্তিতে একপ্রকার প্রশান্তি লক্ষ্য করিতাম। এমনই একদিনের গীতাপাঠ শেষে আলোচনার কিছু অংশ আজও মনেপড়ে, তাহা নিম্নরূপ।

শিষ্য প্রশ্ন করিল গুরুদেব আলো আর আঁধারের মাঝেতো আকাশ-পাতাল ব্যবধান কিন্তু আপনারা প্রায়শ বলিয়া থাকেন জ্ঞানই আলো তাহা হইলে অন্ধকার কি? দয়া করিয়া তাৎপর্য বুঝাইয়া বলিবেন। গুরু বলিলেন সন্ধ্যার পর তোমাকে বলিব, সূর্যাস্তের পর, সন্ধ্যায় আঁধার ঘনাইয়া আসিলে গুরু শিষ্যকে ডাকিয়া কিছুদূরে একজন লোককে দেখাইয়া বলিলেন কেহ যদি তোমাকে প্ররোচিত করিয়া বলে ঐ লোকটি অসাধু বা অসৎ তাকে তুমি মারিলে প্রভূত মঙ্গল হয়, তুমি এই কাজটি করিতে পারিবে? শিষ্য একটু চিন্তা করিয়া বলিল, গুরুদেব আমাকে কর্মের যেই ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়াছেন তদবিবেচনায় মনে হয় ইহা ত আমার কর্ম নয়, আমি তাকে কেন মারিতে যাইব! গুরু আনন্দ চিত্তে শিষ্যের আরো নিকট আসিয়া একটি ছোট পুস্তিকা মেলিয়া তাকে পড়িতে বলিলেন, শিষ্য অবাক হইয়া জানাইল এই অন্ধকারে সে কি করিয়া পড়িবে! গুরু আগামী দিন প্রত্যূষে শিষ্যকে আবার আসিতে বলিয়া প্রস্থান করিলেন।

> জ্ঞানীজন সংবেদনশীল ও উদারচিত্ত। জ্ঞান বিতরণ দ্বারা সমাজকে আলোকিত করিয়া অজ্ঞানতার আঁধার হইতে সুরক্ষা করিতে পারে। যেহেতু অজ্ঞানতা আঁধারের অনুরূপ, জ্ঞানরহিত ব্যক্তির জীবনে পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী।

পরদিন রক্তিম আকাশে সূর্যোদয় হইতেই শিষ্যকে গুরু ডাকিয়া ছোট পুস্তিকাটি মেলিয়া পুনঃ পড়িতে আদেশ দিলেন, আজ দিবালোকে শিষ্য স্পষ্ট অক্ষরগুলি উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিল 'জ্ঞানই আলো, অজ্ঞানতা অন্ধকার'। গুরু বলিলেন তথাস্তু, শিষ্যের হাত ধরিয়া তার হৃদয় আলোকিত দেখিয়া প্রসন্ন হইলেন। শিষ্য অন্ধকারে দাঁড়াইয়া বিগত রাতে পুস্তক পড়িতে পারিল না, কিন্তু তার জ্ঞানের আলোতে আলোকপ্রাপ্ত হৃদয় ঠিক অনুভব করিল, অসাধুকে হত্যা করা তার কর্ম নয়। গুরু বুঝাইলেন, দেখ তুমি অন্ধকারে পুস্তক পড়িতে পারিলে না, তবে তোমার হৃদয়ানুভূতি তোমাকে অন্ধকারে অজ্ঞান রাখিতে পারে নাই, তোমার কি কর্ম আর কোনটা তোমার কর্ম নয় এই জ্ঞান-আলোকে তুমি আলোকিত। শিষ্য গুরুদেবকে প্রণাম করিয়া বলিল হাঁ আজ সে আলো আর আঁধারের তফাত স্বজ্ঞানে কিছুটা অনুধাবন করিতে পারিতেছি।

গুরু আবারও বলিলেন, যিনি জ্ঞানী তিনি আলো আঁধারের পার্থক্য জানেন, ধীরে ধীরে তোমরাও জানিবে। আশীর্বাদ করি তোমাদের সবার হৃদয় জ্ঞানালোক-কিরণে উদ্ভাসিত হউক। অন্ধকারতো অসার, মৃতসম আর আলো জীবিত যেন প্রাণ আছে, ভোরে আলো ছড়িয়া পড়িলে আমরা তাই উজ্জীবিত হইয়া উঠি। আলোতেই যেন আমরা স্পন্দন, গতি, উদ্যম খুঁজিয়া পাই। আলোর শক্তি আছে, গতি আছে, সবকিছু আছে, আলো উদার, সব বিলাইয়া দেয়। অন্ধকারের কিছুই নাই, বিলাইবে কি বরং আমাদের হোঁচট খাইতে সাহায্য করে এবং আলোই অন্ধকার দূর করিতে সক্ষম। তদ্রূপ জ্ঞানই মানুষের হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে পারে। জ্ঞানীজন সংবেদনশীল ও উদারচিত্ত। জ্ঞান বিতরণ দ্বারা সমাজকে আলোকিত করিয়া অজ্ঞানতার আঁধার হইতে সুরক্ষা করিতে পারে। যেহেতু অজ্ঞানতা আঁধারের অনুরূপ, জ্ঞানরহিত ব্যক্তির জীবনে পদস্খলন অবশ্যম্ভাবী। তাই এই জগতে জ্ঞানী মানুষ চাই, আলোকিত হৃদয়ের মানুষ চাই, শুধু ধর্মপ্রাণ মানুষ হইলে চলিবে না। আলোকিত মানুষই এই জগতে কল্যাণ বহিয়া আনিতে যথাযোগ্য অধিকারী। জ্ঞানরহিত ধর্মীয় উন্মত্ততা আজকের এই পৃথিবীকে গ্রাস করিয়া আছে, তাই শত অশুভ অকল্যাণে সমাজ কলঙ্কিত।

২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে একদিন সকালের সংবাদ দেখিতেছিলাম, শিরোনামে ছিল সন্ত্রাসী হামলায় নিহত ও আহতের বিবরণ। সংবাদ দেখা শেষ না করিয়াই নিম্নের কবিতাটি লিখিয়াছিলাম, অনুপ্রেরণা ছিল গুরু-শিষ্য পরম্পরার উপরিউক্ত পটভূমি।

আজ এই পৃথিবীতে।
উষ্ণ চায়ে চুমুক দিচ্ছি,
আর সংবাদে ধ্বংসাবশেষ দেখছি
আজ এই পৃথিবীতে।

প্রতিদিন আয়নায় নিজেকে দেখি
মনের সুস্থতা ফিরে পেতে চাই,
মাথায় ধূসর অবসন্ন চুল আঁচড়ে ফেলে,
ফাটা ঠোঁটে গালাদিয়ে সিলকরে
আমার অবিশ্বাস দূর করতে চাই।
এই সকালে আবারো মর্মাঘাত পেতে চাইনি,
চেয়েছিতো ভরসা পেতে,
আজ এই পৃথিবীতে।
বারবার অবক্ষয়ের সংযোজন
আমরা কি চাই?
অজ্ঞান হয়ে অন্ধকারে থাকবো
নাকি আলোকিত হৃদয় নিয়ে বাঁচব!
বা অভিনয় করব ভাল আছি,
প্রতারণা, বিভক্তি সেই বেশ।
না সমস্যার অংশ হব কেন?
আজ এই পৃথিবীতে।
ধর্মান্ধতা এই বিশ্বে আজ ক্ষত,
সংকীর্ণতা নিয়ে, কেহ বা প্রতিবন্ধী,
অজ্ঞানতাই এখন খুব শক্তিধর।
আজ পাশার ঘুঁটি চকাচক প্লাটিনাম
ভবিষ্যতকে হাতছানি দিচ্ছে,
কিন্তু ভেতরটা ফাঁকা।
আজ এই পৃথিবীতে।
আমাদের শেকড়েরই কি হবে মূলোৎপাটন!
সত্য বলতেই বিস্ফোরণ,
আমরা কি পূর্ণধ্বংসের কাছাকাছি?
আজ এই পৃথিবীতে।
না একটু অপেক্ষা কর সবাই
জগতে আলোকিত বিজ্ঞজন আছেন,
কবি, সাহিত্যিক, লেখক নামে জীবিত
তাঁরা লিখছেন, লিখবেন।
কলমের শক্তি সবচাইতে শক্তিধর
অপেক্ষা কর, শেষ মধুমক্ষিকাটির অদৃশ্য হওয়া অবধি,
আজ এই পৃথিবীতে।
একজন হয়ত পাশে থেকেই লড়ছেন,
মানবতাকে ভালোবাসছেন।
মনে রাখা প্রয়োজন, আমরা কারা?
আমাদের মূল্যবোধ আছে, যোগ্যতা আছে,
সৌন্দর্য, মাধুর্য কি আমরা জানি।
পৃথিবীতে নতুন, সুন্দর দিন আসবে
আজকের এই পৃথিবীতে। ❑

(পুরীতে জগন্নাথের নবকলেবর– ৪৮ পৃষ্ঠার বাকি অংশ)

মন্দিরকে সাতবার প্রদক্ষিণ করানোর পর নতুন বিগ্রহ প্রস্তুতকারী বিশ্বকর্মাদের কাছে হস্তান্তর করা হলে তারা নয়সাদারুকে নির্দিষ্ট মাপে ৪টি খণ্ডে বিভক্ত করেন।

অমাবস্যার দিন নতুন তৈরি বিগ্রহসমূহ শুভযাত্রা সহকারে মূল মন্দিরকে ৩ বার প্রদক্ষিণ করানোর পর অবসরগৃহে পাঠানো হয় যেখানে স্নানযাত্রার পর পুরাতন বিগ্রহ রাখা হয়েছে। ঐদিন গভীর রাত্রে পুরাতন বিগ্রহ হতে নতুন বিগ্রহে ব্রহ্মপদরন্ধ স্থানান্তর করা হয়। ব্রহ্মপদরন্ধ স্থানান্তরের সময় মন্দিরে এমনকি সমস্ত পুরীতে কোন বাতি জ্বলে না। যে চারজন দইতা ব্রহ্মপদরন্ধ স্থানান্তর করেন তাদের চোখ কাল কাপড় দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয় এবং উভয় হাতের কনুই পর্যন্ত কাপড় দিয়ে এমনভাবে মুড়ে দেওয়া হয় যাতে কোন কিছু ধরলে অনুভব করতে না পারেন। ব্রহ্মপদরন্ধ বস্তুত ঘি দিয়ে তৈরি। দইতাগণ নতুন বিগ্রহের গহ্বরে ব্রহ্মপদরন্ধ রেখে উক্ত গর্তের মুখ নয়সাদারু খণ্ড দিয়ে বন্ধ করে দেন।

পুরাতন বিগ্রহের সমাধি ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া :

পরবর্তী সময়ে পুরাতন বিগ্রহসমূহ মন্দিরের পশ্চিম গেইট সংলগ্ন বাগান "কলি বৈকুণ্ঠ" তে মাটির নিচে সমাধি দেওয়া হয়। সমাধি দেওয়ার পর এই কাজে জড়িত দইতাগণ পরবর্তী ৯ দিন স্বল্প আহার করেন এবং কোনো খৌরি কাজ করেন না। দশম দিনে খৌরি কাজ করে, মারকান্দা সরোবরে স্নান করে শুদ্ধ হয়ে তাদের বাড়ি সাদা চুনকাম করে দ্বাদশদিনে জগন্নাথের উদ্দেশ্যে ভোজসভার আয়োজন করেন।

নতুন বিগ্রহে রং করণ ও নবকলেবরের সমাপ্তি :

নতুন বিগ্রহে ব্রহ্মপদরন্ধ প্রবিষ্ট করানোর পর বিগ্রহসমূহ শুক্লপক্ষের পরবর্তী দিনগুলোতে মন্দিরের অবসর-গৃহে রাখা হয়। সেই সময় জগন্নাথের ভোগ মদনমোহনকে, বলরামের ভোগ দোলগোবিন্দকে, সুভদ্রার ভোগ লক্ষ্মীকে ও সুদর্শনের ভোগ নৃসিংহদেবকে প্রদান করা হয়।

কৃষ্ণপক্ষের শুরুতে বিগ্রহসমূহ দাতামহাপাত্রের নিকট অর্পণ করা হয়। তাদের কাজ হলো বিগ্রহে রক্ত মাংসের সঞ্চালন করা। অথর্ববেদ অনুসারে দেহ গঠিত হয় ৭টি ধাতু দিয়ে তাই দাতামহাপাত্রগণ চামড়ার জন্য কাপড়, রক্তের জন্য লাল কাপড়, মাংসের জন্য বৃক্ষের কষ, মজ্জুরির জন্য সুগন্ধি, চর্বির জন্য পেষাচন্দন, ধাতুর জন্য ভাতের মাড় ও হাড়ের জন্য কাঠ বিগ্রহের গায়ে মাখান ও পরানো।

দাতামহাপাত্রদের কাজ শেষ হলে বিগ্রহসমূহ রং করার জন্য চিত্রকরদের কাছে দেওয়া হয়। বিত্রকরগণ চোখের মনি ব্যতীত অন্যান্য অংশ রং করেন। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পূর্ণিমার ১ম দিবসে বিগ্রহে চক্ষুদান করার পর পঞ্চামৃত দ্বারা বিগ্রহকে স্নান করানো হয়। (একটি ব্রোঞ্জ নির্মিত আয়নার প্রতিবিম্বকে স্নান করানো হয়)। পরের দিন রথে নতুন বিগ্রহ বসিয়ে রথযাত্রা শুরু হলে সমাপ্ত হয় নবকলবরের ৩ মাস ব্যাপী অনুষ্ঠান। ❑

পুরীতে জগন্নাথের নবকলেবর

সুব্রত দাশগুপ্ত

সনাতন ধর্মের অনুসারীরা তাদের আরাধ্য দেব-দেবীর আরাধনার জন্য বিগ্রহ তৈরি করেন মাটি, পাথর অথবা বিশেষ ধরনের ধাতু দিয়ে। মাটি নির্মিত বিগ্রহ পূজা শেষে জলে বিসর্জন দেওয়া হয়। মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ সাধারণত পাথর বা ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয় এবং বিসর্জন দেওয়া হয় না। পুরাণ অনুসারে জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন বিগ্রহ তৈরি করা হয় নিমকাঠ দিয়ে এবং একটি সময়ে বিগ্রহসমূহ পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়ে। পুরীর মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ সাধারণত ১২ থেকে ১৮/১৯ বছর পর পরিবর্তন করে নতুন তৈরি বিগ্রহ পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রায় ৩ মাস ব্যাপী যে অনুষ্ঠান করা হয় তাকেই জগন্নাথের নবকলেবর বলা হয়। সুপ্রাচীন কাল থেকে এই নবকলেবর অনুষ্ঠান চলে আসছে। সাম্প্রতিক কালে বিংশ শতাব্দীতে ১৯৩১, ১৯৫০, ১৯৬৭, ১৯৭৭ ও ১৯৯৬ মোট পাঁচ বার ও একবিংশ শতাব্দীর ২০১৫ সালে নবকলেবর করা হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যে-কোন বৎসরে বা সময়ে নবকলেবর করা যায় না তার জন্য প্রয়োজন পড়ে একটি জ্যোতিষশাস্ত্রীয় বিধান।

আমরা জানি যে ৩৬৫ দিন ৬ ঘণ্টায় হয় একটি সৌর বছর। সৌর বছর হিসাব করার সময় ৬ ঘণ্টা হিসাবে না আনার ফলে প্রতি চার বছর পর বাদ পড়া ২৪ ঘণ্টাকে ১ দিন ধরে ফেব্রুয়ারি মাসে ২৯ দিন হিসাব করে সমন্বয় করা হয় যাকে লিপ ইয়ার বলা হয়। অন্যদিকে চান্দ্রমাস হয় ২৯½ দিনে ফলে বছর হয় ৩৫৪ দিনে, সৌর বছর থেকে ১১ দিন কম, তাই চান্দ্রবছরকে সৌরবছরের সঙ্গে সমন্বয় করার জন্য সনাতনধর্মের পঞ্জিকাতে (বাংলা পঞ্জিকা) ৩ (তিন) বছর অন্তর ১টি মাসকে মল বা অধিমাস হিসেবে গণ্য করা হয়। এই মাসকে পুরুষোত্তম মাস বলা হয়। এইরূপ সমন্বয় করা না হলে মুসলিম ধর্মের মত হিন্দুধর্মের বিভিন্ন পূজা পার্বণ -এর বিভিন্ন বৎসরে ঋতু পরিবর্তন হতো।

শাস্ত্রমতে যে বছর জ্যৈষ্ঠ অথবা আষাঢ় মাসে ২টি পূর্ণিমা অথবা ২টি অমাবস্যা থাকে সেই বছরই নবকলেবরের জন্য প্রশস্ত। ২০১৫ (বাংলা ১৪২২ সন)-এর জ্যৈষ্ঠ মাসে ছিল ২টি অমাবস্যা ও মল মাস। নবকলেবর অনুষ্ঠানটি বেশ ব্যয়বহুল, সময় ব্যাপ্তি প্রায় ৩ মাস ও প্রচুর লোকবলের প্রয়োজন।

নবকলেবর-এর ৫টি ধাপ :

(১) বিগ্রহ তৈরির জন্য আনুষ্ঠানিকতা ও পবিত্র নিমবৃক্ষের অনুসন্ধান।

(২) পবিত্র বৃক্ষের কর্তিত অংশসমূহ পুরীতে আনয়ন ও বিগ্রহ তৈরি।

(৩) নব নির্মিত বিগ্রহে ব্রহ্মপদরন্ধ (Brahmpadarntha) স্থাপন।

(৪) পুরাতন বিগ্রহের সমাহিত করণ, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও দইতাদের (dayitas) শুদ্ধিকরণ।

(৫) নূতন বিগ্রহের রংকরণ ও বিগ্রহ পুনঃ প্রতিষ্ঠা।

আনুষ্ঠানিকতা ও পবিত্র নিমবৃক্ষের অনুসন্ধান :

জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রার ৬৫ দিন পূর্বে, চৈত্র মাসের শুক্লপক্ষের দশমী তিথিতে ২৭/২৮ জন দইতা (নবকলেবর গঠনের জন্য নির্বাচিত সেবক, যারা সবর গোত্রের তিরসূরী হিসেবে বংশ পরম্পরায় সেবা দিয়ে আসছেন) নির্বাচন করা হয়। পুরীর জগন্নাথ মন্দিরে মিলিত হয়ে একটি বিশেষ পূজার অংশগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে থেকে একজন দলপতি (পটি মহাপাত্র) ও ৩ জন পিদলপতি নির্বাচন করা হয়। পূজা শেষে প্রত্যেক দইতাকে ৩টি করে জগন্নাথদেবের বিশেষ মালা (অনুমতিপত্র), প্রধান ও উপ-প্রধান ও অন্যান্য সদস্যগণকে যথাক্রমে ৬ মিটার ও ২ মিটার লম্বা রেশমী কাপড় প্রদান সহ প্রত্যেকের কপালে চন্দন লেপনসহ কপালে লাল কুমকুম এর তিলক পরিয়ে দেওয়া হয়। এরপর উক্তদল (বন যাত্রা দল) শঙ্খ ও ঢাকঢোল বাজিয়ে ও গ্রেন্ডরোডস্থ রাজবাড়িতে গমন করে অন্য একটি আনুষ্ঠানিক কাজ সম্পূর্ণ করেন।

> বিশ্বকর্মাগণ যখন বিগ্রহ তৈরিতে ব্যস্ত ঐসময় রাজগুরু ও অন্যান্য পুরোহিতগণ নূতন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু ভিন্নধর্মী পূজা অনুষ্ঠান করে থাকেন যা অন্যান্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আচার-অনুষ্ঠান থেকে ভিন্ন প্রকৃতির।

পরবর্তী শুভদিনের প্রভাতে বনযাত্রা দলের ২০/২১ জন পুরীর উত্তর-পূর্বে অবস্থিত কটকপুর গ্রামের মঙ্গলাদেবীর মন্দিরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বাকি সদস্যরা পুরীতে অবস্থান করেন প্রয়োজন সময়ে দলের সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য। কটকপুর পুরী হইতে ৫০ কি.মি. দূরে প্রাচী নদীর তীরে অবস্থিত। বনযাত্রাদল নগ্নপদে কোন যন্ত্রচালিত বাহন ব্যবহার না করে মঙ্গলাদেবীর মন্দিরে পৌঁছে মঙ্গলাদেবীকে নতুনবস্ত্র প্রদানসহ জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদ নিবেদন করেন। মন্দিরের প্রধান পুরোহিত দেবীর উদ্দেশ্যে দুর্গা সপ্তমী মন্ত্র জপসহ বিশেষ পূজার আয়োজন করেন। এইদিন থেকে পরবর্তী ৩ রাত্র মন্দিরের প্রধান পুরোহিত, ৪জন বিশেষ পণ্ডিত ও পটিমহাপাত্র উক্ত মন্দিরে রাত্রি যাপন করেন। প্রাচীন রীতি ও বিশ্বাস এই যে, মঙ্গলাদেবী মন্দিরে অবস্থানকারী যেকোন একজনকে স্বপ্নের মাধ্যমে পবিত্র বৃক্ষের অবস্থানের কথা জানিয়ে দিবেন। দেবীকে প্রসন্ন করার জন্য মন্দিরে অবস্থানকারীরা রাত্রে নিদ্রা যাওয়ার পূর্বে ১০৮ বার বিশেষ মন্ত্র জপ

করেন। এই ৩ রাত্রের মধ্যে স্বপ্ন প্রাপ্তি না হলে মন্দিরের প্রধান পুরোহিত পুনঃরায় দেবীর বিশেষ পূজা করেন এবং দেবীকে ফুল দ্বারা সজ্জিত করেন। দেবী বিগ্রহ হতে ১ম যে ফুলটি মাটিতে পড়ে তাতে ইঙ্গিত করা হয় জগন্নাথদেবের পবিত্র নিম বৃক্ষের অবস্থান। এইরূপ পরবর্তী ৩টি ফুল এর পতন থেকে জানা যায় বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শনের বৃক্ষের অবস্থান। যে সমস্ত নিমবৃক্ষ হতে বিগ্রহ তৈরি হবে ঐগুলো কোন সাধারণ বৃক্ষ নয়। প্রত্যেক বিগ্রহের জন্য বৃক্ষের কিছু উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য থাকা চাই।

পবিত্র বৃক্ষসমূহের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য :

(১) বৃক্ষের অবস্থান হবে নদী অথবা পুকুর পাড়ে, তিন রাস্তার নিকটবর্তী অথবা ৩ পাহাড় বেষ্টিত, অথবা শিবমন্দির পার্শ্ববর্তী অথবা শ্মশান নিকটবর্তী।
(২) বৃক্ষ হবে রোগ, পোকা ও পরগাছা মুক্ত।
(৩) বৃক্ষে কোন প্রাণী ভোজী পাখির বাসা থাকবে না।
(৪) বৃক্ষটি ঝড় অথবা বজ্রপাতে আঘাত প্রাপ্ত নয়।
(৫) আশেপাশে সাপের অবস্থান অথবা পিঁপড়া ঢিপি আছে।
(৬) বৃক্ষটি অন্যান্য বৃক্ষ যেমন রুরুন, বেল ইত্যাদি গাছ দ্বারা বেষ্টিত।

জগন্নাথদেবের বিগ্রহ-বৃক্ষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য :

(১) বৃক্ষের ছালের (bark) রং হবে কাল অথবা নিকষ লাল (darkred)।
(২) মূল কাণ্ড হবে সরল সোজা। উচ্চতা ৭-১২ হাত।
(৩) বৃক্ষটি ৪টি প্রধান শাখাযুক্ত হবে।
(৪) বৃক্ষে অবশ্যই বিষ্ণুর বিশেষ চিহ্ন যেমন শঙ্খ, চক্র, গদা অথবা পদ্মফুল চিহ্নযুক্ত হবে।

বলরাম বিগ্রহ-বৃক্ষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য :

(১) বৃক্ষের ছাল হবে সাদা অথবা বাদামি।
(২) বৃক্ষে ৭টি প্রধান শাখা থাকবে।
(৩) উপরের ডালপালা এমনভাবে ছড়ানো থাকবে মনে হবে সাপের ফণা।
(৪) গাছের কাণ্ডে বলরামের চিহ্ন যেমন, লাঙ্গল অথবা গদা থাকবে।

সুভদ্রা দেবী বিগ্রহ-বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য :

(১) বৃক্ষের ছাল হবে হলদে।
(২) বৃক্ষের মূল শাখা হবে ৫ টি।
(৩) কাণ্ডে থাকবে পাঁচটি পাপড়ি যুক্ত পদ্মফুল চিহ্ন।

সুদর্শন চক্র বিগ্রহ-বৃক্ষের বৈশিষ্ট্য :

(১) বৃক্ষের ছাল হবে লাল।
(২) বৃক্ষ হবে ৩ টি প্রধান শাখা যুক্ত।
(৩) কাণ্ডে থাকবে চক্র চিহ্ন।

একটি বৃক্ষে উল্লিখিত সব বৈশিষ্ট্য না পাওয়া গেলে অধিকাংশ বৈশিষ্ট্যযুক্ত বৃক্ষ দ্বারা বিগ্রহ তৈরির বিধান আছে।

প্রত্যকদিন সকালে বনযাত্রা দলের সদস্যরা পবিত্র বৃক্ষের সন্ধানে নগ্নপদে জঙ্গলে চলে যান এবং অনুসন্ধানকালীন দিনে একবার আহার করার বিধান। নির্দিষ্ট বৃক্ষ পাওয়ার পরপরই নিকটস্থ ঝোপঝাড় পরিষ্কার করে বৃক্ষের নিকট সুদর্শনচক্র স্থাপন করে বাদ্যযন্ত্র বাজানাসহ বৃক্ষকে সাত বার প্রদক্ষিণসহ, জল সিঞ্চন, চন্দন প্রলেপ-প্রদান, সিঁদুর দান, পুষ্প অঞ্জলি প্রদান, নতুন কাপড় দ্বারা বৃক্ষকে বেষ্টন, জগন্নাথদেবের মন্দির হতে আনা বিশেষ মালা প্রদানসহ বিশেষ যজ্ঞের আয়োজন করা হয়। বৃক্ষ পাশ্ববর্তী স্থানে অস্থায়ী তাঁবু তৈরি করে অবস্থান নেন।

পরবর্তী সময়ে প্রধান পুরোহিত দ্বারা বিভিন্ন পূজা অনুষ্ঠানের পর পুরোহিত পটিমহাপত্রকে বিশেষ মন্ত্রপাঠ সহ একটি স্বর্ণনির্মিত ছোট কুঠার প্রদান করলে পটিমহাপাত্র উক্ত কুঠার হাতে নিমবৃক্ষটি প্রদক্ষিণের সময় বৃক্ষ কর্তনের অভিনয় করেন। তদ্রূপ ১টি ছোট রৌপ নির্মিত কুঠার দ্বারা এইরূপ অনুষ্ঠান শেষে প্রধান পুরোহিত দলের সঙ্গে আগত বিশ্বকর্মাদের (কাঠ মিস্ত্রি) লৌহ নির্মিত কুঠার প্রদান করলে প্রকৃত বৃক্ষ কর্তন শুরু হয়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানকালীন সময়ে পণ্ডিতগণ বৈদিক মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং বাদ্যযন্ত্রীরা বিভিন্ন প্রকারের বাদ্যযন্ত্র বাজান। বৃক্ষটি সতর্কতার সহিত কর্তন করতে হয় যাতে বৃক্ষটি কাটার পর বৃক্ষটি উত্তরদিকে অথাব পূর্বদিকে অথবা উত্তর-পূর্বদিকে মাটিতে পড়ে। বৃক্ষ কর্তনের পর মূল কাণ্ডসহ প্রয়োজনীয় অংশ রেখে বাকি ডালপালা মাটিতে চাপা দেওয়া হয়।

পুরী অভিমুখে কাঠসহ শুভযাত্রা ও বিগ্রহ তৈরি :

বিগ্রহ তৈরির সংগৃহীত কাঠসমূহ পুরীতে নেওয়ার জন্য কাঠ নির্মিত বিশেষ যান তৈরি করা হয়। বিগ্রহ তৈরির কাঠ/দারু কোনো যন্ত্রচালিত বাহনে নেওয়ার কোনো বিধান না থাকায় উক্ত বাহন নির্মাণের প্রচীন রীতি/বিধান অনুসারে বাহনটির পাটাতন হবে কেন্দু কাঠের, চাকা হবে ভেটা গাছের, গাড়ির চক্রনেমী (axle) হবে তেঁতুল কাঠের। গাড়িতে কাঠগুলো রঙিন বস্ত্র দ্বারা ঢেকে দেওয়া হয় এবং শুভদিন দেখে শুভযাত্রাসহ পুরী অভিমুখে যাত্রা শুরু হয়। এই কাজ জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার পূর্বেই শেষ করতে হয়।

জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমার দিন জগন্নাথদেবের মন্দিরের উত্তর-পূর্ব কোণে স্থাপিত একটি মঞ্চে (stage) মন্দিরের প্রতিষ্ঠিত জগন্নাথ, বলরাম, সুভদ্রা ও সুদর্শন চক্রের বিগ্রহকে বিধি মোতাবেক স্নান করানো হয় যাহা জগন্নাথদেবের "স্নান যাত্রা" নামে পরিচিত। পরবর্তী দিবস হতে ৬ সপ্তাহ মন্দিরের দরজা বন্ধ থাকে। অন্যদিকে কটকপুর হতে আনা দারু (wood) সমূহ একটি নিভৃত স্থানে রেখে স্নান করানো হয়। স্নান যাত্রার পরদিন পুরীর মন্দিরের নির্মাণ মণ্ডপে নেওয়া হয় এবং কৃষ্ণপক্ষের দ্বিতীয়ার দিন থেকে বিশ্বকর্মাগণ (বিদ্যাপতি ও বিশ্ববসুর বংশধর) নতুন বিগ্রহ তৈরি শুরু করেন। বিগ্রহ নির্মাণ শেষ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্বকর্মাগণ ব্যতীত অন্য কেউ নির্মাণ মণ্ডপে যেতে পারে না। কাজ করার সময় যাতে কোনো শব্দ বাইরে যেতে না পারে সেজন্য বাইরে প্রচণ্ড শব্দে বাদ্যযন্ত্র বাজানো হয়। বিগ্রহ নির্মাণ কৌশল অতি গোপনীয়। জগন্নাথ, বলরাম ও সুদর্শনের উচ্চতা ৮৪ যব, সুভদ্রা বিগ্রহের উচ্চতা ৫২১/২ যব। যব এক প্রকার দানা শস্য, খোসা ছাড়ানোর পূর্বে যার দৈর্ঘ্য প্রায় ১"।

জগন্নাথ ও বলরামের বিগ্রহের হাতের বৈশিষ্ট্য :

জগন্নাথ ও বলরামের হাত আলাদাভাবে তৈরি করে মূল দেহে সংযোগের আলাদা বৈশিষ্ট্য আছে। প্রত্যেকটি হাতের ২টি অংশ থাকে। জগন্নাথের একটি হাতের (দুই খণ্ডের) মোট দৈর্ঘ্য ৪২ যব। ১ম খণ্ডের দৈর্ঘ্য ২০ যব ও ২য় খণ্ডের দৈর্ঘ্য ২২ যব। ২০ যব সমন্বিত হাতের খণ্ড জগন্নাথের বাম ও ডান কাঁধে ১২ যব পরিমাণ ঢোকানো হয় ফলে বাইরে থাকে ৮ যব। উক্ত ৮ যব পরিমাণ অংশে ২২ যব সমন্বিত খণ্ডটি জুড়ে দেওয়া হয় ফলে জগন্নাথ দেবের প্রত্যেকটি হাতের ৩০ যব পরিমাণ বাইরে থাকে যার মধ্যে ২২ যব পরিমাণ হাত সামনে প্রসারিত থাকে। অন্যদিকে বলরাম বিগ্রহের প্রত্যেকটি হাতের মোট দৈর্ঘ্য ৩৬৩/৪ যব। জগন্নাথদেবের হাতের মত হাতের ২টি খণ্ড, একটির দৈর্ঘ্য ১৩৩/৪ যব ও অন্য অংশ ২৩ যব। ডান ও বাম কাঁধে ১৩৩/৪ যব খণ্ডের ৭ যব প্রবিষ্ট করা হয় এবং বাইরে থাকে ৬৩/৪ যব। উক্ত অংশের সামনের দিকে জুড়ে দেওয়া হয় ২৩ যব সমন্বিত খণ্ড যাহা সামনের দিকে প্রসারিত থাকে। ফলে বলরাম বিগ্রহের হাত জগন্নাথ বিগ্রহের হাত থেকে ১ যব পরিমাণ বেশি লম্বা হয়। বিশ্বকর্মাগণকে ১৩ দিনের মধ্যে বিগ্রহ তৈরি শেষ করতে হয়।

নতুন গঠিত বিগ্রহে ব্রহ্মপদরন্ধ্র প্রবিষ্টকরণ :

বিশ্বকর্মাগণ যখন বিগ্রহ তৈরিতে ব্যস্ত ঐসময় রাজগুরু ও অন্যান্য পুরোহিতগণ নতুন বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু ভিন্নধর্মী পূজা অনুষ্ঠান করে থাকেন যা অন্যান্য বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার আচার-অনুষ্ঠান থেকে ভিন্ন প্রকৃতির। পুরোহিতগণ নতুন বিগ্রহের পরিবর্তে কটকপুর হতে আনা দারুর একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খণ্ড যাকে "নয়সা দারু" বলা হয়। তাকে নিয়ে ২ সপ্তাহ ব্যাপী বিভিন্ন শাস্ত্রীয় আচার-অনুষ্ঠান করেন, পরে এই দারুখণ্ডটি একটি নির্দিষ্ট মাপে ৪ খণ্ডে বিভক্ত করে নতুন নির্মিত ৪টি বিগ্রহের নির্দিষ্ট গর্তের মুখ বন্ধ করার জন্য ব্যবহৃত হয়। উক্ত নির্দিষ্ট গর্তে ব্রহ্মপদরন্ধ্র রাখা হয়।

অনুষ্ঠানের ১ম দিনে রাজা কর্তৃক নিয়োগকৃত অধ্যক্ষ মন্দিরের পূর্বদিকে যেখানে বিশ্বকর্মাগণ বিগ্রহ নির্মাণরত তার নিকট প্রতিষ্ঠা মণ্ডপের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন মাপের ও বিভিন্ন আকৃতির মণ্ডল অংকন করেন। তারপর অধ্যক্ষ সাদা বস্ত্র পরিহিত হয়ে চক্রমণ্ডলে নৃসিংহদেবের সন্তুষ্টির জন্য পূজা আরম্ভ করেন। পূজারীরা কলসির জলে সিদ্ধিদাতা গণেশ, বিভিন্ন দিকপাল ও অন্যান্য দেবতাদের আহ্বান মন্ত্র জপ করেন। অধ্যক্ষ দশদিকপাল ও মণ্ডলের বাইরে ভূতগণকে মাটি উৎসর্গ করেন। এইভাবে প্রত্যেকদিন বিকালে মাটি উৎসর্গ করার পর সপ্তমীর দিন দিকপালসমূহ ও ভূতগণকে জীবন্ত মাগুর মাছ উৎসর্গ করে। মণ্ডপের বাইরে দশদিকে মাটির নিচে মাগুর মাছগুলোকে সমাহিত করা হয়। বিশ্বের কোথাও এভাবে কোন বিষ্ণু মন্দিরে মাছ অথবা পশু উৎসর্গ করার কোনো নজির না থাকলেও জগন্নাথ মন্দিরে কেন করা হয় তার কোনো কারণ জানা যায় না।

অন্যদিকে ৬ষ্ঠ দিনে নয়সাদারুকে স্নানের জন্য প্রস্তুত করা হয়। প্রথমে যজ্ঞ অগ্নিতে ১০৮ বার খাঁটি ঘি আহুতি দেওয়ার পর ৯৮টি পবিত্র জলপূর্ণ কলসির ঘি সিঞ্চন করা হয়। ৯৮টি কলসির মধ্যে ১৭টি কলসিতে দেওয়া হয় ফুল, ফল, সুগন্ধি, জাফরান ও গঙ্গাতীরের মাটি। একটি মন্ত্রপূত কবজে সরিষা ও দূর্বাঘাস দিয়ে তা সূতা দিয়ে নয়সাদারুকে বেঁধে নিয়ে স্নান মণ্ডপে নেওয়া হয়। উক্ত নয়সাদারুকে উপরে উল্লিখিত ১৭টি কলসির জল দ্বারা স্নান করানোর পর অবশিষ্ট ৮১টি কলসির জল নয়সাদারুর উপর ঝুলন্ত সহস্র ছিদ্রযুক্ত একটি কলসিতে ঢেলে দেওয়া হয়, ফলে উক্ত জল নয়সাদারুর উপর ছাতা আকৃতিতে বৃষ্টির জলের মত পড়তে থাকে। উক্ত অনুষ্ঠান চলাকালে ব্রাহ্মণগণ নির্দিষ্ট কিছু মন্ত্র জপ করেন।

অভিষেক স্নানের পর শুকনা কাপড় দ্বারা নয়সাদারুকে মুছে আরও কিছু পূজা অনুষ্ঠানের পর দারুকে প্রতিষ্ঠা মণ্ডপের উপর বসিয়ে জল ও ভোগ নিবেদন করার পর কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। পরের দিন অধ্যক্ষ নৃসিংহদেবের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ অনুষ্ঠান শুরু করেন। যজ্ঞে ১০,০০০ বার ঘি, পল্লব, অর্ধসিদ্ধ চাল, তিল, বার্লি, নারিকেল ও কন্দমূল আহুতি প্রদান করেন। একদিনে ২০০০ বার এর বেশি আহুতি প্রদান সম্ভব হয় না বিধায় ৫দিন ব্যাপী এই যজ্ঞ চলে। একাদশীর দিন বিষ্ণুমন্ত্র জপ করে ১০০৮টি আহুতি প্রদান, দ্বাদশীর দিন ১৮ সংকেতসহ গোপাল মন্ত্র জপ করে একই সংখ্যক আহুতি, ত্রয়োদশীতে ৬ সংকেত সংবলিত সুভদ্রা মন্ত্র ও ভুবনেশ্বরী মন্ত্র জপ করে একই সংখ্যক আহুতি দেওয়া হয়। চতুর্দশী ও প্রয়োজন বোধে অমাবস্যার দিন সংরক্ষিত রাখা হয় লক্ষ্মী, সরস্বতী, শিব, কালি, বিমলা, দুর্গা ও অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে। আহুতি দেওয়া হয় মজুদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত। অন্যদিকে চতুর্দশীর দিন নয়সাদারুকে একটি গাড়িতে করে মূল

(পরবর্তী অংশ ৪৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

FEMALE DIVINITY IN HINDUISM

Dr. Sourendra K. Banerjee

The concept of female Divinity developed over centuries in inter-textual Scriptures. The epithet Mahadevi (1st as in tall, 2nd as in father) or simply as Devi as the Supreme Being is synonymous with the term 'Mother'. As pure consciousness She is primordial matrix or the great womb in which potentiality thrives at the dawn of creation. This idea of an abstract medium in which creation gestates incorporates the concepts of Prakriti, Shakti and Maya (both as in father) which have been thriving in India over a long time. Prakriti as the material principle in cosmogony is found in Samkhya Karika as well as in ancient Jain and Buddhist texts. Prakriti may be conceived as a multidimensional field (neither existence, nor no- existence) where subtlest (really transcendent) 'guna' or units of created beings (Sentient or not) constantly move. However Prakriti is subservient to Purusha(s). Yogasutra talks about the 'chief purusha' which later becomes Isvar or Saguna Brahma(n). Purusa or Isvar is the efficient cause of creation. In some texts Isvar provides the seeds to Prakriti which becomes 'Visvagarva' (Womb that gestates the Cosmos).

> The Vedic statement "Truth is one, scholars use multiplicity of names" should guide us in our study.

Prakriti as a creative principle is comparable to Shakti. Rigved (3.5) uses the word 'Bal' many times, "the great divine might of all gods is unique". Later Scriptures extend this 'might' as Kundalini (coiled) Shakti in all human beings. The femininity of this Shakti becomes explicit in Vedic goddesses and in Tantrik and Puranic literature. All Hindu Schools accept Shakti as a Cosmogonic principle. Radhakrisnan says that the Ultimate Principle Brahman (both as in tall). Carries pluralities and contraries within itself and the Universe is the manifestation (Bibhuti) of its Shakti (power, energy, potency). Certain Purans (like Markandeya) go so far as to suggest that Shakti is Brahman. Thus Supernormal Brahma Shakti is simultaneously the provider of seeds of creation as well as the womb for gestating.

Some schools in Hinduism would suggest that the phenomenal universe is Maya (both as in father) or a mere appearance. The cosmos is a stage where Mahamaya (the Devi) shows a shadow playing performance. She is the 'Aghatan Ghatan Patiyasi' the One Whose 'Lila' (play) creates 'makebelief in 'happenings' out of 'non-happenings'. They think Brahman is the exclusive reality. They interpret Maya as meaning non-being (Ma is 'not' and Ayam is 'this/this entity). Many others would interpret 'Ma' to mean to measure. Therefore the universe of beings in a contingent reality, depending entirely on Brahma Shakti.

However all Theistic Schools will agree that reliance entirely on mundane reality or materialism is an intrinsic ignorance (Avidya). The Mother Mahamaya causes this but Her Grace will bestow Bodhi (insight) or ultimate realization of the Truth. Both Svetasvatar Upanisad (4.10) and Gita (7.14) state so. Devishakti is the foundation of all experiences and incorporates the essence of Prakriti and Maya. These are considered conceptually and grammatically female.

In Vedas multiple goddesses appear as comogonic principles. Apa (water) is the primordial unmanifest foundation. She is revered as Amrita or elixir of immortality. Ambrosia (as water in rosta/food) is the essence of food. Water and food make a being. Water as 'ocean of consciousness' is like the Mother's womb. Here all gods gather at the dawn of creation. (R.V. 10.17.10: Apa asmamataaha etc, R.V. 10.82.5: kang svigarvang Yatra Deva etc.). Purusa Sukta says that Divine breathing (spanda) in water initiated the creative process. We may note Apa is feminine but salil is also neutral and Samudra is male. R.V. 10.63.2 describes another goddess Aditi (the unbound) as well as earth. Aditi is the mother as well as the father of beings. Viraj is another female goddess. R.V. 10.90.5 says Viraj and the Purus (the archetypal Man) create each other (Tasmadvirara jayata virajo Adhi Purusah etc.) We note that in these goddesses gender identities are loosened. Androgynous and hermaphrodite concepts (as in Biblical Adam the first man who creates Eve) are undercurrent. Vedas also describe Viraj is a

(পরবর্তী অংশ ৬৫ পৃষ্ঠায় দেখুন)

ছেলেবেলার দুর্গাপূজো–কিছু স্মৃতি কিছু বেদনা

ভগীরথ মিশ্র

[এক]

ছেলেবেলায় আমাদের গাঁয়ে কোনও বারোয়ারি দুর্গাপুজো হ'ত না। গোটা এলাকা জুড়ে কেবল আমাদের গাঁয়ের জমিদার বাড়িতেই হ'ত পারিবারিক দুর্গাপুজো। সত্যি কথা বলতে কী, দুর্গাপুজোটা গাঁয়ের অধিকাংশ মানুষের কাছেই কোনও সুখকর অভিজ্ঞতা ছিল না। তখন আশ্বিন কিংবা কার্তিক মাস। আমাদের একফসলা জমির দেশে, বৈশাখ মাসের মধ্যেই ধান-চাল ফুরিয়ে যেত অধিকাংশ বাড়িতে। আষাঢ়ের মাঝামাঝি থেকে ভাদ্রের মাঝামাঝি অবধি চাষের জমিতে কাজ জুটত মজুরদের। দিনান্তে আধপেটা হলেও জুটত। ভাদ্রের মাঝামাঝি থেকে পুনরায় কর্মহীন হয়ে পড়ত গাঁয়ে-ঘরের বারো আনা মানুষ। তারপর আসত সেই ঘোর আশ্বিন ও কার্তিক– দীর্ঘ দু'দুটো মাস। গাঁয়ের বারো আনা মানুষের ঘরে একদানাও ধান-চাল নেই। মাঠে-ঘাটে কাজও নেই তিলমাত্র। গোটা ছেলেবেলা জুড়েই দেখেছি, ওই দু'টো মাস আমাদের এলাকায় নেমে আসত পুরোপুরি দুর্ভিক্ষের করাল ছায়া। এলাকার বারো আনা মানুষ বলা যায় তখন অনাহারেই দিন কাটাত। বনে-বাদাড়ে, পুকুরপাড়ে ঘুরে ঘুরে, কুড়িয়ে-বাড়িয়ে নিয়ে আসত কন্দকচু, শাকপাতা– দিনান্তে ওগুলোই সেদ্ধ করে পেটে পুরত। আর, উপোসি পেটে ওইসব অখাদ্য-কুখাদ্য প্রবেশ করা মাত্রই বাধিয়ে দিত ধুন্ধুমার কাণ্ড। বাহ্যি, বমি, –উপোসি শরীরগুলো তাতে করে আরও অসাড় হয়ে যেত। এমনকি, নিম্নবিত্ত পরিবারগুলোতেও দেখেছি, কোন গতিকে দুটো পয়সা সংগ্রহ করে পরিবারের কর্তাটি দিনান্তে এক কিলো আটা নিয়ে বাড়ি ফিরল। সেই আটা এক হাঁড়ি জলে ফুটিয়ে বাড়িসুদ্ধ মানুষ এক বাটি করে পেটে পুরে খিদে মেটাল। মনে পড়ে, ওই দিনগুলোতে প্রতিদিনই গ্রামের কোন না কোন প্রান্ত থেকে কান্নার রোল উঠত। কিনা, মাঝিপাড়ায় ভাগবৎ দলুইয়ের মা বসতে বসতে ঢলে পড়েছে মাটিতে। কিংবা চারগেড়্যার পুঁটু মান্নার বউটা একনাগাড়ে পাঁচদিন অনাহারে থেকে আজ চলেই গেল ওপারে। বাস্তবিক, আমাদের ছেলেবেলায় প্রতিবছরই ওই দু-আড়াই মাস ভয়াল হয়ে দেখা দিত গোটা এলাকায়। ঠিক তেমনই পরিস্থিতিতে প্রতিবছর গাঁয়ের জমিদার বাড়িতে বেজে উঠত পুজোর ঢাক। উপোসি অর্ধচেতন মানুষগুলো সেই ঢাকের আওয়াজে নিভু নিভু চোখ দুটিকে অতি কষ্টে খুলত। পরমুহূর্তে আবার বুজে আসত চোখ দুটি। বলাই বাহুল্য, ওই পুজোয় যোগ দেওয়ার মতো অবস্থায় থাকত না গাঁয়ের বারো আনা মানুষ। তাদের তখন অষ্টপ্রহর চলছে একপেটে খিদের সঙ্গে নখে-দাঁতে লড়াই।

মাঝিপাড়ার গয়াপ্রসাদ দলাই শাস্ত্র-পুরাণের গল্প-টল্প অল্পবিস্তর জানত। একান্তে ঠোঁট বেঁকিয়ে বলত, এমন ঘোর দুর্দিনে পূজা? উৎসব? এটা তো আসল দুর্গাপুজোই লয়। রামচন্দর রাবণ-রাজাকে হারাবার তরে, লঙ্কার বালুচরে অকালবোধন করেছিল। তা, রামচন্দর ছিল রাজার ব্যাটা, তার পক্ষে বছরের সব মাসই পৌষ মাস। একালেও, তার সমকক্ষ যারা, রাজা, জমিদার– তারাই কেবল এমন অসময়ে মেতে উঠতে পারে উৎসবে। এটা হইল রাজা-রাজড়াদের দুগ্‌গাপূজা।

> রামচন্দর রাবণ-রাজাকে হারাবার তরে, লঙ্কার বালুচরে অকালবোধন করেছিল। তা, রামচন্দর ছিল রাজার ব্যাটা, তার পক্ষে বছরের সব মাসই পৌষ মাস। একালেও, তার সমকক্ষ যারা, রাজা, জমিদার– তারাই কেবল এমন অসময়ে মেতে উঠতে পারে উৎসবে। এটা হইল রাজা-রাজড়াদের দুগ্‌গাপূজা।

দেখেছি, মহালয়ার পর থেকেই ছকবাঁধা গরুর গাড়িতে চড়ে রোজদিন আসছে সুবর্ণ-বর্ণা, সালঙ্কারা রমণীর দল...জমিদারবাড়ির বউ-ঝি, আত্মীয়-কুটুমের দল। মেঠো পথে গরুর গাড়ির ঢকচানিতে তাদের সোনার অঙ্গে স্বর্ণালংকারগুলি সুরেলা হয়ে বাজত অবিরাম। দুধসাদা, ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবি পরে, পায়ে পাম্প-শ্যু মসমসিয়ে গাঁয়ের পথে হেঁটে আসতেন গৌরবর্ণ পুরুষেরা। সকলেই জমিদার বাড়ির আত্মীয়বর্গ ওরা।

তখন রোজদিন বাবুদের দিঘিতে জাল পড়ছে। উঠে আসছে পাকা পাকা রুই-কাতলা। বিশাল বিশাল পিস বানিয়ে ডুবন্ত তেলে দিনভর ভাজা চলছে ওই মাছ। ঝোল-ঝাল, কালিয়া কোর্মা রেঁধে চলেছে মিহির ঠাকুর। রোজ সকালে খাঁটি ঘি'তে লুচি ভাজার গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে হাওয়ায়। সুজির মোহনভোগের সৌরভে ম-ম করছে বাতাস। তার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে অন্তঃপুরচারিণী যুবতীদের কলহাস্য...। নিজেদের মধ্যে আড্ডা খুনসুটি করতে করতে মাঝে মধ্যেই সুরেলা হাসিতে ভেঙে পড়ছে তাঁরা।

সদর মহলে তাসপাশার আসর বসছে রোজ। মাঝে মাঝেই হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে যুযুধান দু'পক্ষের আস্ফালন, হু-হুংকার, অট্টহাস্য...। নিস্তেজ হয়ে আসা উপোসি শরীরগুলো দূর থেকে শুনতে থাকে সবকিছু। ডুবন্ত তেলে ভাজা পাকা মাছ, খাঁটি ঘিয়ে ভাজা লুচি আর মোহনভোগের সুবাস হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে অজান্তে ঢুকে পড়ে ওদের অসাড় হয়ে আসা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ে। ক্ষণকালের জন্য সাড়া ফিরে আসে তাতে। মানুষগুলো লম্বা করে শ্বাস টেনে নেয় হাওয়ায়। তারপর পুনরায় ঝিমিয়ে পড়ে।

আমাদের আর্থিক অবস্থা অবশ্য এতখানি শোচনীয় ছিল না। বরং বলা যায় বেশ সচ্ছল ছিল। আমার বাবা ছিলেন গ্রামের প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। আমাদের গাঁয়ের শেষ জমিদারটিও ছিলেন বাবার ছাত্র। সেই সুবাদে জমিদার বাড়িতে বাবার বেশ কদর ছিল। আমরা বাচ্চারা তার সুযোগ পুরোপুরি ভোগ করেছি ছেলেবেলায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে, ছেলেবেলায় পুজোর ক'দিন আমাদের মতো গুটিকয়েক ভাগ্যবান বাচ্চার জীবনে ভারী মিষ্টি সুবাস বয়ে আনত।

প্রতিবছরই পুজোর আগে বাবা যেতেন মেদিনীপুর শহরে। সংসারের গুরুত্বপূর্ণ সামগ্রীগুলি কিনে-টিনে বেশ গভীর রাতে ফিরতেন তিনি। সাধারণত অত রাত অবধি কস্মিনকালেও জেগে থাকতাম না আমরা, বাচ্চারা। কিন্তু ওই রাতটায় কিছুতেই ঘুম আসত না চোখে। কারণ, আমরা তো জানি, অন্য সামগ্রীর পাশাপাশি আমাদের জন্যও নতুন জামা-কাপড় কিনে আনবেন বাবা। সেই কারণেই ওই সন্ধেটা ছিল আমাদের কাছে বছরের অন্য সন্ধেগুলোর চেয়ে একেবারেই স্বতন্ত্র। আমরা অনেক রাত অবধি ওই জামা-কাপড়ের টানেই জেগে থাকতাম। বাবা আমাদের সামনে সদ্য কেনা জামা-কাপড়গুলি বের করে ধরে দিতেন। আমরা যে যার জামা-কাপড়গুলোকে নিজে নিজের গায়ের সঙ্গে লটকে দিয়ে মাপটা দেখে নিতাম। তারপর, যে যার বিছানায় ওগুলোকে নিয়ে ঘুমিয়ে পড়তাম।

[দুই]

ষষ্ঠীর ভোরে বাবুদের বাখুলে ডজনডাক ঢাক বেজে উঠত একসঙ্গে। চড়াচ্চড় আওয়াজে সকালের আকাশ-বাতাস উতরোল হয়ে উঠত। আমরা ভাইবোন ক'জনা ঠাঁই নিতাম বাবুদের ঘরে। মাস্টারমশাইয়ের ছেলেপুলে জ্ঞানে কিঞ্চিৎ বাড়তি মনোযোগও পেতাম। ওইদিন ও পরবর্তী তিনদিন আমাদের সকালের জলখাবার থেকে রাতের ভোজ অবধি সবই হতো বাবুদের বাড়িতে।

পুজোর তিনদিন যাত্রাগান হত মন্দিরের সামনে প্রশস্ত নাটমণ্ডপের তলায়। সামনের সারিতে বাবুভায়ারা বসতেন। ওঁদের পেছনে বসত অন্যান্যরা। আমরা অবশ্য আসরের সামনেই বসবার সুযোগটা পেতাম। বাবুদের বাড়িতেই রাতের খাওয়া সাঙ্গ করে আমরা সটান চলে যেতাম যাত্রার আসরে। পালাগান শেষ হলে ঘুম ঘুম চোখে ফিরে আসতাম বাড়ি। পরের দিন সকালে উঠেই আবার দে দৌড় বাবুদের ঘরে। আর, তখনই খবর পেতাম, গেল রাতে মারা গিয়েছে কোন পাড়ার কোন এক হতভাগ্য। একপেট খিদে নিয়ে কাতরাতে-কাতরাতে বেচারা চলে গিয়েছে ওপারে। তারপরই তো এল ওই অভিশপ্ত রাতটি। যে রাতের স্মৃতি আজও ভুলতে পারিনি। পরবর্তীকালে আমার বহু রচনায় বহু অনুষঙ্গে এসেছে ওই রাতটির কথা।

[তিন]

সেটা বুঝি নবমীর রাত। কাঁথি থেকে এসেছে ওই সময়ের বিখ্যাত অপেরাদল 'চলন্তিকা অপেরা'। হিমাংশু পণ্ডা, বেণী পণ্ডা, মধু পণ্ডা, হেমন্ত বরদের মতো ওই সময়ের আসর কাঁপানো কুশীলবরা ছিলেন ওই দলে। ওই রাতে ওরা গাইছে 'মহম্মদ তুঘলক' পালা। মহম্মদ তুঘলকের রোল করেছেন স্বয়ং হিমাংশু পণ্ডা। প্রথম অঙ্ক থেকেই জমে উঠেছে পালা। মহম্মদ তুঘলকের দরবারে নেচে চলেছে লাস্যময়ী নর্তকীরা। দেখতে দেখতে মজে রয়েছে গোটা আসর। হেনকালে কলরব উঠল গাঁয়ের একপ্রান্তে। আসরে বসেই মানুষজনের কানে পৌঁছাল ওই আওয়াজ। তৎক্ষণাৎ প্রায় গোটা আসর দৌড় মারল ওইদিকে। দেখাদেখি আমরাও। ততক্ষণে সবাই বুঝে ফেলেছে, গাঁয়েরই কারো ঘরে ডাকাত পড়েছে। সেটা তখন স্বাভাবিক ছিল। ডাকাতরা জানত, নামী-দামি অপেরার পালাগান শুনতে বাবুভায়ারা ঝেঁটিয়ে যাবেন বাবুদের গড়ে। বাড়িতে বুড়োথুড়োরা ছাড়া আর কেউই থাকবে না। ওই সুযোগটাকে প্রায়শই কাজে লাগাত ওরা। কলরবটা ভেসে আসছিল তিতামণি-দিদার বাড়ির খিড়কি-পুকুরের দিক থেকে। তিতামণি-দিদারাও জমিদারদের একটা ছোট তরফ। অচিরেই সবাই পৌঁছে গেলাম অকুস্থলে। জানা গেল, একটা চোর ধরা পড়েছে তিতামণি-দিদাদের বাড়ির খিড়কি-পুকুরের পাড়ে। বাড়ির মাহিন্দাররা চোরটাকে বামাল পাকড়াও করে চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। এক্কেবারে পাশটিতে গিয়ে চোরটাকে দেখামাত্র, বড়দের কী মনে হয়েছিল জানিনে, কিন্তু আমার কচি বুকের মধ্যেটা একেবারে হু-হু করে উঠেছিল।

আমাদের গাঁয়েরই শশী ভূঁইয়া। দীনহীন খেত-মজুর। এমনিতে প্রবল হাঁফানির টানে সারাক্ষণ বুকটা হাঁপরের মতো লাফায়। সংসারে সাত-আটটি পোষ্য নিয়ে এই ঘোর কার্তিকে তার অবস্থা একেবারেই সঙ্গিন। শুনতে পাই, দিনের পর দিন না খেয়ে, কিংবা শাকপাতা খেয়ে কোনো গতিকে বেঁচে রয়েছে।

আমাদের এলাকায় পুকুরের পাড়ে-টারে তখন এন্তার বুনো ওলের গাছ জন্মাতো নিজের থেকেই। বর্ষায় ওগুলো ঝাড়ে-বংশে বাড়ত। আশ্বিন-কার্তিকের পর থেকে ওই গাছগুলোর তলায় মাটি খুঁড়ে ওল বের করা যেত। তবে ঐ ওল অসম্ভব কুটকুটে হত। অবস্থাপন্নরা ওই বস্তুটিকে পারতপক্ষে খেত না। খেত গরিব-গুরবোরা। তাও কুচি কুচি করে কেটে, রাতভর জলে ভিজিয়ে রেখে, সেদ্ধ করে, সরষে-বাটা, লেবুর রস কিংবা তেঁতুলের মণ্ড মিশিয়ে খেত।

দেখলাম, বাবুদের মাহিন্দারদের দ্বারা বেষ্টিত হয়ে শশী তখনও অবধি কুকুরের মতো হাঁফাচ্ছে। পাশটিতে রয়েছে, চুরির মাল হিসেবে গুটিকয়েক বুনো ওল এবং একটি বোঁচা কোদাল।

নিমেষের মধ্যে বাকিটা বুঝে ফেললাম সবাই। নিদারুণ অনাহার সইতে না পেরে বেচারা এসেছিল বাবুদের খিড়কি-পুকুরের পাড়ে কয়েকটা বুনো ওল চুরি করতে। বাবুর বাড়ির পাহারাদার মাহিন্দারদের হাতে ধরা পড়ে গিয়েছে। সবাই ওই নিয়ে প্রচুর হাসাহাসি করল। গ্রামবাসীদের মধ্যস্থতায় ওগুলো শশীকেই দান করল মাহিন্দাররা। কিন্তু তার তখন ওলগুলোকে বয়ে নিয়ে বাড়ি অবধি পৌঁছানোর মতো অবস্থা নেই। জনাকয় সহৃদয় গ্রামবাসীর মধ্যস্থতায় মাহিন্দারদের একজন ওলগুলো ওই রাতে পৌঁছে দিয়েছিল শশী'র বাড়ি।

ছেলেবেলার দুর্গাপুজোর স্মৃতি রোমন্থন করতে বসলে, আজও ওই রাতের স্মৃতিটা মনের মধ্যে কদর্যভাবে ভেসে ওঠে। ❑

ছবিমুড়া-উনকোটি-জম্পুই পাহাড়-ডুম্বুর লেক

সন্দীপন মজুমদার

ত্রিপুরা ভ্রমণের এই পর্বে রোমাঞ্চ বাড়াবে জলযাত্রা। সাক্ষী থাকুন ইতিহাস ও অসামান্য শিল্পকর্মের। যান 'চিরবসন্তের দেশে'। এবার তৃতীয় তথা শেষ পর্ব।

দেবতামুড়া বা দেওতামুড়া পাহাড়শ্রেণি বিস্তৃত রয়েছে উদয়পুর ও অমরপুরের মধ্যে (দুটি জায়গার মধ্যে দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার)। গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত এই দেবতামুড়া পাহাড়ের একাংশে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করে সৃষ্টি করা হয়েছে হিন্দু দেবদেবীর প্রচুর মূর্তি। নদীর পাড় থেকে উঠে যাওয়া, কোথাও ৬০-৭০ ডিগ্রি, কোথাও বা ৯০ ডিগ্রি কোণে খাড়া উঠে যাওয়া পাহাড়ের দেওয়ালে সুনিপুণ দক্ষতায় তৈরি এই সব শিল্পকর্ম একেবারে যেন ছবির মতোই। আর তাই বোধ হয়, দেবতামুড়া পাহাড়ের এই অংশের নামও হয়েছে ছবিমুড়া।

এই জলযাত্রায় সবচেয়ে বেশি যেটা নজর কাড়বে তা হল দশভুজা দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটি। প্রায় ২০ ফুট উঁচু বিশাল এই দেবীমূর্তিকে স্থানীয় উপজাতিরা অবশ্য 'চক্রাকমা' নামেই মানে। দেবীমূর্তির চুলের জায়গায় জড়ানো আছে অসংখ্য সাপ, আর পদতলে মহিষাসুরের পাশে রয়েছেন রুদ্রভৈরব।

প্রামাণ্য তথ্য অনুযায়ী, ১৫০০-১৬০০ শতাব্দীর সময়কালেই নির্মাণ হয়েছিল এইসব শিল্পকর্ম। এখানকার বিশেষত্ব যেটা, গোমতী নদীর জলে নৌকা বা মোটরবোটে ভেসেই দেখতে হবে এইসব অনুপম সৃষ্টি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গণেশ, কার্তিক, বিশ্বকর্মা-সহ আরও অজস্র দেবদেবী ও পশুপাখির মূর্তি খোদাই করা রয়েছে পাহাড়ের উঁচু প্রাচীরে। মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া গোমতী নদীর জলে এই নৌকাযাত্রা (আধ-ঘণ্টার মতো সময় লাগবে এক দিকে যেতে) উপভোগ্য হবে প্রতিটি মুহূর্ত। আমাজনের ঘন জঙ্গলে ঢাকা পরিবেশে নদীতে নৌকা ভ্রমণের অসাধারণ দৃশ্যের সঙ্গে অনেকটাই সাদৃশ্য আছে ছবিমুড়ার এই জলযাত্রার। নিস্তব্ধ পরিবেশে বিচিত্র পাখির বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাগমও দৃষ্টি আকর্ষণ করবে।

তবে এই জলযাত্রায় সবচেয়ে বেশি যেটা নজর কাড়বে তা হল দশভুজা দুর্গার মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিটি। প্রায় ২০ ফুট উঁচু বিশাল এই দেবীমূর্তিকে স্থানীয় উপজাতিরা অবশ্য 'চক্রাকমা' নামেই মানে। দেবীমূর্তির চুলের জায়গায় জড়ানো আছে অসংখ্য সাপ, আর পদতলে মহিষাসুরের পাশে রয়েছেন রুদ্রভৈরব। অসম্ভব সুন্দর, অনবদ্য এই প্রাচীন মূর্তিটি যেভাবে খাড়া পাহাড়ের প্যানেলে খোদিত হয়েছে, সেই দৃশ্য পর্যটককে অভিভূত করবে।

এই জলযাত্রায় দুটি জায়গায় নামা যায় (বর্ষাকালে অবশ্যই নয়) জল কম থাকলে। এক জায়গায় ঘন জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ৪০০-৪৫০ মিটার দুর্গম পথে, হাঁটুজল মাড়িয়ে পায়ে হেঁটে গেলে দেখা মিলবে 'ছড়া' দেবতার।

স্ট্যালাকটাইট ও স্ট্যালাগমাইটের সংমিশ্রণে তৈরি হওয়া চমৎকার এক প্রাকৃতিক স্থাপত্য এখানে উপজাতিদের কাছে পূজিত হন 'ছড়া' দেবতারূপে। আর এক জায়গায় বোট থেকে নেমে দুর্গম হাঁটাপথে দেখে নেওয়া যায় এক ঝর্না ও গুহাও। পায়ে হাঁটা পুরো পথটাই গেছে ঝর্নার জলে সিক্ত পাথরের উপর দিয়ে। ছবিমুড়া ঘাট থেকেই বিভিন্ন মোটরবোট (ছোট-বড়) বা নৌকা ছাড়ে এইসব ঘুরিয়ে দেখানোর জন্যে। মোটামুটিভাবে এক ঘণ্টার এই জলযাত্রার জন্য ভাড়া ৭০০ টাকা ৫ জন সওয়ারির ছোট নৌকার ক্ষেত্রে। আর ১২, ১৮ কিংবা ২০ জনের মোটরবোটের খরচ পড়বে ১০০ টাকা মাথাপিছু।

ছবিমুড়া

গোমতী নদীতে ভেসে ছবিমুড়া

পদ্মপূর্ণ ঘাটে জলখাবারের দোকান রয়েছে, সেখানেও পর্যটকেরা খাওয়া-দাওয়া সারতে পারেন। পাশেই রয়েছে একটি 'ইন্টারপ্রিটেশন সেন্টার', যেখানে ছবি-সহ এখানকার বিভিন্ন দ্রষ্টব্য বর্ণিত আছে। উদয়পুর থেকে অমরপুরের দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার, অমরপুর থেকে ছবিমুড়ার দূরত্ব ৮ কিলোমিটার, আর আগরতলা থেকে দূরত্ব ৯০ কিলোমিটার। পৌষ-সংক্রান্তির সময় প্রতি বছর 'ছবিমুড়া উৎসব' হয় এখানে। উপজাতিদের নাচ-গান সমৃদ্ধ সেই রংবাহারি উৎসব স্থানীয় কৃষ্টি, ঐতিহ্য ইত্যাদি সম্পর্কে একটা আকর্ষণীয় ছবি তুলে ধরে পর্যটকদের সামনে।

ঊনকোটি

উত্তর-পূর্ব ত্রিপুরায় অবস্থিত ঊনকোটি বর্তমানে জেলার মর্যাদা পেয়েছে। কোটির থেকে এক কম, এটাই হল ঊনকোটির আক্ষরিক অর্থ, খুবই চিত্তাকর্ষক ও আকর্ষণীয় গল্প চালু আছে এই ঊনকোটিকে ঘিরে।

কিংবদন্তী অনুসারে, কৈলাস থেকে কাশী যাওয়ার পথে এক কোটি দেবদেবীসহ কৈলাসপতি শিব রাত্রিবাসের জন্য বেছে নিয়েছিলেন এ জায়গাকেই। তবে সঙ্গী দেবগণকে এই সাবধানবাণীও শুনিয়েছিলেন যে সকালে সূর্যোদয়ের আগেই সবাইকে এই স্থান ত্যাগ করে কাশী অভিমুখে রওনা দিতে হবে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে শিবঠাকুর ছাড়া আর কোনও দেবতারই গভীর ঘুম ভাঙল না সূর্যোদয়ের আগে। সঙ্গীহীন ক্রুদ্ধ শিব একাই রওনা দিলেন কাশীর পথে, আর তাঁরই অভিশাপে পাথরে পরিণত হলেন কোটির থেকে এক কম (শিবকে ছাড়া) অর্থাৎ ঊনকোটি নিদ্রামগ্ন দেবতা।

আবার অন্য জনশ্রুতি অনুসারে স্থানীয় ভাস্কর কালু কামার স্বপ্নাদিষ্ট হন, এক রাতের মধ্যে এক কোটি দেবতার মূর্তি গড়তে পারলে এই জায়গা কাশীধামের সমান মর্যাদা পাবে। দক্ষ ভাস্কর কালু

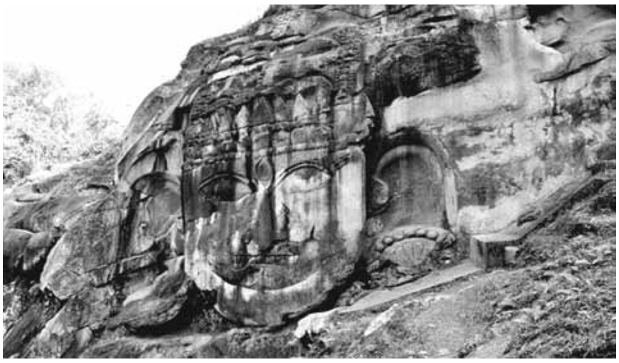

ঊনকোটির চন্দ্রশেখর শিব

সারারাতের অক্লান্ত পরিশ্রমে যখন প্রায় এক কোটি মূর্তি নির্মাণ সেরে ফেলেছেন, বাকি আছে মাত্র একটি মূর্তি, সেই অবস্থায় শিল্পীর ইচ্ছে হল নিজের একটি মূর্তি গড়ে নিয়ে, তারপর বাকি এক দেবতার মূর্তিটি নির্মাণ করবেন, সেক্ষেত্রে শিল্প ও শিল্পী, দু'রকমের মূর্তিই চিরকালীন এক গুরুত্ব পেয়ে যাবে। কিন্তু বিধি বাম। শিল্পীর এই আত্মগরিমা হয়তো ঈশ্বরের পছন্দ হয়নি। তাই দৈব দুর্বিপাকে রাত ভোর হওয়ার (অর্থাৎ সূর্যোদয়ের) আগে বাকি থেকে যাওয়া দেবতার মূর্তিটি আর গড়া হয়ে উঠল না কালু কামারের, আর সেভাবেই কাশীধামের সমমর্যাদা প্রাপ্তিও ঘটল না ঊনকোটির।

ঘন জঙ্গলে ঘেরা, রঘুনন্দন পাহাড়ে (বর্তমান নাম অবশ্য ঊনকোটি পাহাড় বা বেলকম টিলা) পাহাড় গাত্রে খোদাই করে, আর পাথর কেটে বানানো হয়েছে প্রচুর হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি। কিংবদন্তীর গল্প কৌতূহল জাগালেও ইতিহাস ও প্রামাণ্য তথ্য অনুসারে, ঊনকোটির এইসব মূর্তির নির্মাণকাল অষ্টম থেকে নবম শতাব্দীর মধ্যে মূলত শৈবতীর্থ হিসেবেই খ্যাত ছিল এই জায়গা। তাই শিবের মূর্তি (এখানে প্রধানত মুখমণ্ডলই নির্মিত হয়েছে বিগ্রহরূপে) বেশি দেখা যায় এই চত্বরে। ঊনকোটিশ্বর শিবের মূর্তিটির উচ্চতা ৩০ ফুট।

ঊনকোটির কালভৈরব

মাথার মুকুটের উচ্চাতাই হল ১০ ফুট, যার এক দিকে রয়েছে সিংহবাহিনী দুর্গা ও অন্যদিকে পতিতপাবনী গঙ্গার মূর্তি। এই বিশাল মূর্তিটি ছাড়াও আরও রয়েছে কালভৈরব, চন্দ্রশেখর শিব, তিরধনুক হাতে কামদেবের মূর্তি, ত্রিমূর্তি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর একত্রে), নৃসিংহ, রাধাকৃষ্ণ, হনুমান, সরস্বতী, উমা-মহেশ্বর, শনি, নন্দী ইত্যাদি দেবদেবীর মূর্তি। আর কিছু উল্লেখযোগ্য মূর্তি হল বিশালাকার তিনটি গণেশ মূর্তি ও একটি চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি। পাথর কেটে বানানো বিশাল মূর্তিগুলি সত্যিই বিস্ময় জাগায়। পাহাড়ের অনেকটা অংশ জুড়ে ছড়ানো এই মূর্তিগুলি দেখার জন্য চড়াই-উতরাই পায়ে হাঁটা পথ ধরে সময় নিয়ে ঘুরতে হবে। খুঁটিয়ে দেখা ও কোনটা কী, সবিস্তার জানার ইচ্ছে থাকলে, কৈলাশহরবাসী গাইড রাহুল পালের (ফোনঃ ০৯৪৩৬৯২৭৮৮৮) সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন। সময় কম থাকলে, সবটা ঘুরে দেখতে গেলে গাইডের সাহায্য প্রয়োজনীয় হতে পারে।

সদর শহর কৈলাশহর থেকে ঊনকোটির দূরত্ব ১২ কিলোমিটার। কৈলাশহরের হোটেলে রাত্রিবাস করেই ঊনকোটি দর্শন করা যেতে পারে। রাজধানী আগরতলা থেকে কৈলাশহরের দূরত্ব ১৭৬ কিলোমিটার। ঊনকোটিতে মার্চ-এপ্রিল মাসে অশোকাষ্টমী উৎসব উপলক্ষ্যে বড় মেলা বসে। দূরদূরান্ত থেকে পুণ্যার্থীর দল আসে পুজো দিতে। আগরতলা থেকে ঊনকোটির দূরত্ব ১৮০ কিলোমিটার, ছবিমুড়া থেকে দূরত্ব ৯০ কিলোমিটার।

জম্পুই পাহাড়

ত্রিপুরার উত্তর-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত জম্পুই পাহাড়কে বলা হয় 'চিরবসন্তের দেশ'। ৩০০০ ফুট উচ্চতায় অবস্থিত জম্পুই ত্রিপুরা রাজ্যের সর্বোচ্চ হিলস্টেশনও বটে। পূর্বদিকেই মিজোরাম পাহাড়। সীমান্ত ভাগ হয়েছে মিজোরাম রাজ্যের সঙ্গে। এখান থেকে ৮-১০ ঘণ্টার গাড়ি যাত্রায় পৌঁছানো যায় মিজোরামের রাজধানী আইজলে। দক্ষিণে আন্তর্জাতিক সীমান্তে ভাগ হয়েছে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামের সাথে। জম্পুই থেকে তরঙ্গায়িত মিজোরাম পাহাড়ের অপূর্ব দৃশ্য পর্যটককে মুগ্ধ করবে।

বেশ কয়েকটি গ্রাম আছে জম্পুই পাহাড়ে। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় গ্রামটির নাম ভাংমুন। সরকারি ট্যুরিস্ট লজের অবস্থানও এই ভাংমুনেই। ভাংমুন বা বেটলিংচিপ (ভাংমুন থেকে দূরত্ব ৩০ কিলোমিটার) থেকে দেখা সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের দৃশ্য সত্যিই অসাধারণ। জম্পুই পাহাড়ের কমলালেবুর খ্যাতি আছে।

অক্টোবরের মাঝামাঝি থেকে ডিসেম্বরের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাওয়া যায় এই সুস্বাদু ফলটি। প্রতি বছর নভেম্বরের মাঝামাঝি জম্পুই পাহাড়ে 'কমলালেবু উৎসব' (পর্যটন উৎসব বলা যেতে পারে) অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় উপজাতীয় মানুষদের নাচ-গানে অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে এই উৎসব।

প্রধানত লুসাই (মিজো) ও রিয়াং উপজাতির মানুষই বসবাস করেন জম্পুই পাহাড়ে। তাদের বাড়িঘরের স্থাপত্যগত বৈশিষ্ট্য, ছোট ছোট পরিচ্ছন্ন গ্রামগুলি নজর কাড়বে। কমলালেবু ছাড়াও প্রচুর পরিমাণে সুপারি, কলা, দুষ্প্রাপ্য অর্কিড মেলে জম্পুই পাহাড়ে।

জম্পুই পাহাড়

মনোরম আবহাওয়ায়, ছুটির অবকাশ যে মধুর হয়ে উঠবে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। আগরতলা থেকে জম্পুই পাহাড়ের দূরত্ব (ভাংমুন) ২২৫ কিলোমিটার, উনকোটি থেকে জম্পুই-এর দূরত্ব ১০০ কিলোমিটার।

ডুম্বুর লেক

রাইমা ও সাইমা (সরমা নদীও বলেন কেউ কেউ) নদীর সঙ্গমস্থলে তৈরি হওয়া এই ডুম্বুর লেকটি ত্রিপুরার মধ্যে সব থেকে বড় সরোবর, ৪১ বর্গকিলোমিটার আয়তনের এই বিশাল লেকটি হল অজস্র পাখির নিশ্চিন্ত আশ্রয়। শীতকালে প্রচুর পরিযায়ী পাখির দেখাও মেলে এই ডুম্বুর লেকে। এই সরোবরের আকৃতি অনেকটা শিবের ডমরুর মতোই। আর সেই থেকেই লেকের এ রকম নামকরণ হয়েছে। লেকের চারপাশ ঘন অরণ্যাবৃত পাহাড় দিয়ে ঘেরা। ৪৮টি দ্বীপ রয়েছে এই বিরাট লেকের মধ্যে, একটির মধ্যে নারকেল গাছের নিবিড় সবুজ বনও চোখে পড়ে। ইচ্ছে করলে বোট নিয়ে ভেসে পড়তে পারেন লেকের জলে। গোমতী নদীর সৃষ্টিও হচ্ছে লেকের কাছ থেকেই। উৎসস্থলটি 'তীর্থমুখ' নামেই খ্যাত। স্থানীয় উপজাতিদের কাছে খুবই পবিত্র এই স্থানটি। প্রত্যেক বছর পৌষ-সংক্রান্তিতে এক বড় মেলা বসে এই জায়গায়।

আগরতলা থেকে ডুম্বুর লেকের দূরত্ব ১২০ কিলোমিটার, উদয়পুর থেকে দূরত্ব ৬৫ কিলোমিটার আর অমরপুর থেকে দূরত্ব ৩৪ কিলোমিটার।

রাত্রিবাস

(ক) ছবিমুড়া দেখতে হলে মেলাঘরে 'সাগরমহল ট্যুরিস্ট লজ' (এসি দ্বিশয্যা ঘর ৭৫০-৯০০ টাকা), কিংবা উদয়পুর 'গোমতী যাত্রী নিবাস'-এ (এসি দ্বিশয্যা ঘর ৬০০-৮০০ টাকা) থেকেও

ডুম্বুর লেক

দেখে নিতে পারেন। আর কাছাকাছি থাকতে চাইলে অমরপুরে 'সাগরিকা পর্যটন নিবাস' (নন এসি দ্বিশয্যা ঘর ৪০০ টাকা, এসি দ্বিশয্যা ঘর ৫০০ টাকা)।

(খ) উনকোটি দেখতে গেলে থাকতে হবে কৈলাশহরে (দূরত্ব ১২ কিলোমিটার) 'উনকোটি ট্যুরিস্ট লজ'-এ (এসি দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৭০০-১৫০০ টাকা)। এছাড়া ধর্মনগরে (দূরত্ব ২০ কিলোমিটার) 'জুরি ট্যুরিস্ট লজ'-এ (নন এসি দ্বিশয্যা ঘর ৫০০ টাকা, এসি দ্বিশয্যা ঘর ৭০০-৮৫০ টাকা) থেকেও ঘুরে নিতে পারেন উনকোটি।

(গ) জম্পুই পাহাড়ে থাকতে হবে ভাংমুনে ত্রিপুরা ট্যুরিজমেরই 'ইডেন ট্যুরিস্ট লজ'-এ। দ্বিশয্যা ঘরের ভাড়া ৭০০-৭৫০ টাকা।

(ঘ) ডুম্বুর লেক দেখতে গেলে থাকতে হবে অমরপুরের 'সাগরিকা পর্যটন নিবাস'-এ (নন এসি দ্বিশয্যা ঘর ৪০০ টাকা, এসি দ্বিশয্যা ঘর ৫০০ টাকা)।

যাত্রাপথ

আগরতলা থেকে গাড়ি ভাড়া করেই ঘুরে নিতে হবে এইসব জায়গা। ছবিমুড়া দেখে ডুম্বুর-উনকোটি-জম্বুই এই ক্রমানুসারে দেখে নিতে পারেন পর্যটন কেন্দ্রগুলি। প্রতিদিন গাড়ি ভাড়া পড়বে ছোট গাড়ির ক্ষেত্রে (ইন্ডিকা, ওয়াগন আর, ইকো ইত্যাদি) ২২০০-২৫০০ টাকা। আর বড় গাড়ির ক্ষেত্রে (স্করপিও, বোলেরো, জাইলো ইত্যাদি) ৩০০০-৩৫০০ টাকা।

গাড়ি বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ করতে পারেন: সঞ্জীব আচার্য, নীলজ্যোতি ট্রাভেলস্, আগরতলা, ফোন: ০৯৪৩৬৪-৫৬০৮৮, ০৯৮৫৬০-৯৩০০৭।

তবে জম্পুই যেতে গেলে ছোট গাড়ি না নিয়ে বড় গাড়ি নিয়ে যাওয়াই উচিত হবে। ❑

বিস্তারিত তথ্য ও সরকারি ট্যুরিস্ট লজ বুকিংয়ের জন্য কলকাতা যোগাযোগ:
অতুল দেববর্মা
অধিকর্তা, ত্রিপুরা ট্যুরিজম, কলকাতা শাখা
ত্রিপুরা ভবন, প্রিটোরিয়া স্ট্রিট, কলকাতা-৭১
ফোন: ৯৩৩১২-৩১৪৫৯, (০৩৩) ২২৮২-৫৭০৩
(কলকাতার কোড-০৩৩)

নারী-পুরুষের সমন্বিত কর্মোদ্যোগে সার্থক হবে কোজাগরী লক্ষ্মীপুজো

হরপ্রসাদ সেনশর্মা

বাঙালির 'বারো মাসে তেরো পার্বণ'। আর এই তেরো পার্বণকে ঘিরে নানান অনুষ্ঠান পালন করা হয়।এর মধ্যে অন্যতম জনপ্রিয় পার্বণ হল 'কোজাগরী' লক্ষ্মীপুজো। বাঙালির ঘরে ঘরে, বিশেষ করে এই পুজোয় মা-বোনদের যেন ব্যস্ততার আর শেষ থাকে না। তাই লক্ষ্মীর পরিচয়টা জানার জন্যে মনটা কৌতূহলী হয়ে ওঠে। আমরা বাঙালিরা জানি লক্ষ্মী হলেন দুর্গার মেয়ে। দেবী দুর্গার পুজোয় মায়ের সঙ্গে অন্য চার ভাইবোনেরও পুজো হয়। কিন্তু দেবী লক্ষ্মী যে মা দুর্গার মেয়ে এই বিষয়ে প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রে কোনও উল্লেখ নেই। এমনকী প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনেও এর প্রমাণ পাওয়া যায় না। তবে দেবী দুর্গাই যে মহালক্ষ্মী 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' তার উল্লেখ দেখা যায়। ওড়িশা প্রদেশে প্রথম নারী জাগরণের আন্দোলন শুরু হয় লক্ষ্মীপুজো বা দেবী লক্ষ্মীর আরাধনার মধ্যে দিয়ে। তারপর ধীরে ধীরে প্রতিবেশী প্রদেশগুলিতেও যেমন– পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি স্থানেও ছড়িয়ে পড়ে লক্ষ্মীপুজো। পশ্চিমবঙ্গে দেবী লক্ষ্মীকে শক্তি ও সৌভাগ্যের দেবী বলে মনে করা হয়। দেবীকে নারীশক্তির প্রতীক বলেও মনে করা হয়। প্রতি সপ্তাহে বৃহস্পতিবারে আমাদের বাঙালিদের ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপুজো হয়। পুজো করেন বাড়ির মেয়েরা। ঘট পাতেন, পাঁচালি পড়েন, ফুল, ফল, নৈবেদ্য দিয়ে আরতি করেন, ভক্তিভরে সংসারের সকলের মঙ্গল কামনা করে প্রণাম করেন। মেয়েদের এই পুজো-পাঠ নিয়ে কিন্তু সমাজপতিরা কিছু বলেন না। কিন্তু কোজাগরী লক্ষ্মীপুজোয় মেয়েরা পুজোর জোগাড় করবেন, অথচ পুজো করার অধিকারিণী হবেন না কেন, বুঝতে পারি না। আজ একবিংশ শতাব্দীতে এসেও মেয়েরা কেন অনেক জায়গায় লক্ষ্মীপুজোর অধিকারিণী হতে পারল না, ভাবতেও অবাক লাগে। হয়তো এমন অনেক পরিবার আছে, যেখানে শাঁখ বাজিয়ে, ঘণ্টা বাজিয়ে ঘটা করে লক্ষ্মীপুজো হচ্ছে। পুরোহিত মশাইও তা মেনে নিয়েছেন। আসলে সেই পরিবারের মেয়েরা হয়তো পুজোর বিষয় সব কিছু জানেন। তাই নিষ্ঠাভরে, ভক্তিসহকারে, নিয়ম-কানুন মেনে সুষ্ঠুভাবে মহিলারা অনায়াসেই লক্ষ্মীপুজো করতে পারেন। কিন্তু সমাজ যদি বিধিনিষেধের বেড়াজালে আটকে, শালগ্রাম শিলা (নারায়ণ স্বরূপ) মহিলারা স্পর্শ করতে পারবেন না নিষেধাজ্ঞা জারি করে, তাহলে মা লক্ষ্মীর পূজা মহিলারা করবেন কী করে? অথচ কী আশ্চর্য! যে দেবীর পুজো, তিনিও কিন্তু একজন নারী। কিন্তু এই মহিলারাই বাড়িতে প্রতিদিন নানান দেবদেবীর আরাধনা করেন। তবে কি তাঁরা কিছুটা অমঙ্গলের আশঙ্কায়, আবার কিছুটা সংস্কারের বশে, পুরুষের দ্বারা পুজোতেই সম্মতি দিয়েছেন, সে যে রকম ভাবেই হোক না কেন।

আত্মশক্তিতে আস্থাশীল নারীশক্তির প্রগতির জন্যে আজ আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতেই হবে। বিশেষ করে নারীসমাজকে মনে রাখতে হবে, লক্ষ্মীপুজোর মধ্যে দিয়েই তাঁদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও তেজকে জাগিয়ে তুলে নির্দিষ্ট পথে চললেই তাঁরা যে শুধু সৌভাগ্যেরই অধিকারিণী হবেন তাই নয়, সেই সঙ্গে সম্পদ ও প্রাচুর্য লাভ করবেন।

আলপনা দেওয়া, পুজোর বাজার করা, দেবী লক্ষ্মীকে সাজানো, পুজোর উপকরণাদি সংগ্রহ, ভোগ রান্না, নৈবেদ্য গড়া, প্রদীপ জ্বালানো, আরতির ব্যবস্থা, এমনকী পুরোহিত মশাই পুজো শুরু করার পর তাঁর হাতে হাতে সব কিছু এগিয়ে দেওয়া, অঞ্জলি দেওয়া, শাঁখ বাজানো, ধূপ-ধুনো, কর্পূরের ব্যবস্থা ইত্যাদি সব কিছু করে বাড়ির মা, মেয়ে, বউরা। এ সব কাজে তাঁদের অধিকার আছে, তাই তাঁরা অনায়াসেই এইসব কাজ সম্পন্ন করেন। কিন্তু একটা অধিকার থেকে যেন তাঁরা বঞ্চিত। সেটা হল বেশ কিছু বাড়িতে মা লক্ষ্মীর পুজোয় মহিলাদের অধিকার থাকে না। এই বিষয়ে পুরুষের একাধিপত্যই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। জানি না, কেন?

অথচ, আগেকার দিনে, যখন যৌথ পরিবার ছিল,তখন প্রতি পরিবারে একটি মাত্র লক্ষ্মীপুজোর আয়োজন হত। আর পরিবারে বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ মহিলারা থাকার ফলে পুরোহিতের খুব একটা প্রয়োজন হত না। মা, জেঠিমারাই নিষ্ঠা সহকারে মা লক্ষ্মীর পুজো করতেন। বাড়ির সকলে উপস্থিত থাকতেন। সংসারের সকলের মঙ্গল কামনাই ছিল তাঁদের একমাত্র প্রার্থনা।

এটা ঠিক যে সময় পালটেছে। তার সঙ্গে আনুষঙ্গিকেরও পরিবর্তন ঘটেছে। যা আগে ভাবা যেত না, প্রয়োজনের সুবাদে আমরা তা মেনে নিয়েছি এবং নিচ্ছি। অণু পরিবার এখন সবচেয়ে অসুবিধার মুখোমুখি। একলা সব কিছু সামলাতে পারছে না। পুজোর সংখ্যাও বেড়েছে। ঘরে ঘরে পুজো হচ্ছে। পুরোহিত মশাইদের চাহিদা মাত্রা ছাড়িয়েছে। এক ঘরে পুজো সারা হতে না হতেই অন্য ঘরের ডাক এসে যায়। রাত পর্যন্ত ক্রমাগত ছোটাছুটি। এক একবার মনে হয়, মা লক্ষ্মীর পুজোয় বোধহয় পুরোহিত মশাইও সারারাত জেগে থাকেন। দেখেন, আর কোন বাড়ি যেতে বাকি রইল! ক্লান্তিটুকু যেন আজকের জন্যে তাঁরা নিঙড়ে ফেলেন। তবে আত্মশক্তিতে আস্থাশীল নারীশক্তির প্রগতির জন্যে আজ আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতেই হবে। বিশেষ করে নারীসমাজকে মনে রাখতে হবে, লক্ষ্মীপুজোর মধ্যে দিয়েই তাঁদের অন্তর্নিহিত শক্তি ও তেজকে জাগিয়ে তুলে নির্দিষ্ট পথে চললেই তাঁরা যে শুধু সৌভাগ্যেরই অধিকারিণী হবেন তাই নয়, সেই সঙ্গে সম্পদ ও প্রাচুর্য লাভ করবেন। আর 'কোজাগরী' লক্ষ্মীপুজোও যথার্থভাবে সফল হবে। মনে রাখতে হবে নারীর কর্মশক্তি এবং উদ্যোগ আর পুরুষের প্রেরণার মতো শ্রেষ্ঠ সম্পদ আর নেই। উভয়ের সমন্বিত প্রয়াস সার্থক করে তুলুক আজকের এই 'কোজাগরী' লক্ষ্মীপুজো। ❑

শারদীয় সংখ্যা-২০১৮

শ্রীমদ্ভগবদগীতা: সমাজে অপরাধ প্রবণতা ও তার প্রতিরোধের উপায়

বিদ্যুৎ মজুমদার

সমাজে অন্যায় বৃদ্ধি পেতে থাকলে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়ে। সমাজে দারিদ্র্য থাকতে পারে, অজ্ঞান থাকতে পারে, ওগুলি রাষ্ট্রকে দুর্বল করে না। কিন্তু যদি অবিচার থাকে আর তার মাত্রা যদি বৃদ্ধি পেতেই থাকে তবে তা সমাজের গণতান্ত্রিক কাঠামোটিকে নড়বড়ে করে দেবে। সমাজের ক্ষমতাধারী লোক যদি ক্ষমতার অপব্যবহার করে তখনই অন্যায় অবিচার সমুপস্থিত হয়। এইসব লোকের মধ্যে কোন আধ্যাত্মিক শক্তি নেই, যার সাহায্যে সে ক্ষমতাকে হজম করে তা দিয়ে জনহিতকর কাজ করতে পারে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধি ও লক্ষ লক্ষ লোকের সমস্যা সমাধানের জন্য গণতান্ত্রিক পদ্ধতিকে সাহায্য করতে প্রয়োজন একটি তত্ত্বনির্ধারক দর্শনের। সেই দর্শনই শ্রীকৃষ্ণ আমাদেরকে গীতার মাধ্যমে দিয়েছেন। গীতার এই দর্শন আপনাকে শিক্ষা দেবে সর্ব লোক-কল্যাণের জন্য আপনার ক্ষমতাকে কীভাবে প্রয়োগ করতে হবে সেই বিষয়ে। আমাদের ক্ষমতার প্রয়োজন আছে, কিন্তু আমাদের জানতে হবে কিভাবে রাষ্ট্রের কল্যাণে, জনগণের কল্যাণে করা যায় এর প্রকৃষ্ট ব্যবহার; সেই হজম শক্তি ক্ষমতাধারীদের আসে তাদের অন্তর্নিহিত এক গভীরতর উৎস থেকে, যথা মানবসত্তার আধ্যাত্মিক প্রকৃতি। আমাদের প্রধানমন্ত্রী একজন ক্ষত্রিয় (কারণ তিনি দেশের প্রশাসনিক কাজে জড়িত)। এইভাবে এঁরা সকলেই ক্ষত্রিয়, কারণ এঁরা ক্ষমতাধারী– মুকুটধারী নাও হতে পারেন। তাঁদের ক্ষমতা আছে; কিন্তু তাঁদের সকলেরই একটি নতুন ধরনের সামর্থ্য চাই, যার দ্বারা ঐ ক্ষমতাকে হজম করতে পারবেন ও তা সর্বলোকের কল্যাণে ব্যবহার করবেন। যাতে এই ক্ষমতা দিয়ে তাঁরা-তাঁদের চারিদিকে যেসব মানুষ রয়েছে-তাদের সেবা করার সামর্থ্য লাভ করেন। **"জনান্ পরিপিপালয়িতুম্"**–'জনগণকে এমনভাবে শাসন করতে হবে, যে তারা যেন নিজেদের মহৎ বলে মনে করে' –একেই বলে লোকতান্ত্রিক রাষ্ট্র। রাজনীতিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতার সংস্পর্শে এসে লোকে নিজেদের মহৎবোধ করবে, ক্ষুদ্র হবে না। ক্ষুদ্র হয় সামন্ততান্ত্রিক প্রশাসনে। সব রকম অভিজ্ঞতাকে হজম করা দরকার। আর কেবল একটি শক্তিই আছে, যা তাদের হজম করাতে পারে; তা হলো আমাদের আধ্যাত্মিক শক্তি। আধ্যাত্মিকতার অগ্নি সব রকম ক্ষমতাকে হজম করাতে পারে। সেই শক্তির বিকাশ যখন তুমি ঘটাতে পারবে, তখন সবকিছুই সহজ হয়ে যাবে। তখন কোন অবিচার নয়, কোন দলন নয়, কোন শোষণ নয়, কেবল মানবিকতার ভাব, সেবার ভাবই তোমাকে অনুপ্রাণিত করতে থাকবে তোমার সারা কর্মজীবন ধরে। তুমি যদি প্রাশসনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের অন্তত ১০ বা ১৫ শতাংশকেও এই দর্শনের ভাবাদর্শে শিক্ষিত করে তুলতে পার তবে মানবিক পরিস্থিতিতে এক প্রচণ্ড পরিবর্তন সাধিত হবে।

সামাজিক অপরাধ কীভাবে লাঘব করা যাবে? আমাদের সকলের কাছে একটি উপায় আছে: প্রহরীর সংখ্যা বাড়ান, পুলিশের সংখ্যা বাড়ান। সংসদে আইন-কানুন অনুমোদন করা। আমরা বরাবর এমনটাই করে থাকি। আমরা এখন বুঝেছি যে এর দ্বারা ফল লাভ একেবারেই সম্ভব নয়। মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি বলে একটা কিছু আছে। শিক্ষা ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হবে ঐ আধ্যাত্মিক উন্নতির উন্মেষ ঘটানোতে ও সমাজের অন্য লোকজনের সঙ্গে শান্তিতে বাস করতে পারে এমন সুরুচিপূর্ণ নাগরিক হতে আমাদের সহায়তা করা। সংসদে অনুমোদিত আইনের মাধ্যমে মানুষকে নীতিবান করা যায় না। করা যায় শিক্ষার মাধ্যমে। আমাদের মধ্যে উন্মেষ ঘটাতে হবে, আমাদের অন্তর্নিহিত সুন্দর সম্ভাবনাগুলির, যাতে শান্তিপ্রিয়তা, মানবিকতা, উৎসর্গ ও সেবার মনোভাব প্রভৃতি আমাদের অন্তর থেকে ফুটে উঠে; তবে এ সম্ভব হয় যদি আমরা মানবের মন নামক অদ্ভুত বস্তুটিকে ঠিক মতো পরিচালিত করতে পারি। অতএব শিক্ষাব্যবস্থায় মনের প্রশিক্ষণ অতি জরুরি। একমাত্র গীতাতেই রয়েছে মানব মনের প্রশিক্ষণের তত্ত্বদর্শন।

আমাদের মধ্যে উন্মেষ ঘটাতে হবে, আমাদের অন্তর্নিহিত সুন্দর সম্ভাবনাগুলির, যাতে শান্তিপ্রিয়তা, মানবিকতা, উৎসর্গ ও সেবার মনোভাব প্রভৃতি আমাদের অন্তর থেকে ফুটে উঠে; তবে এ সম্ভব হয় যদি আমরা মানবের মন নামক অদ্ভুত বস্তুটিকে ঠিক মতো পরিচালিত করতে পারি।

গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ"(২/৪০) –এই তত্ত্বদর্শনের সামান্য মাত্রও অভ্যাস করলে মানুষের বড় ভয়ের কারণ দূরীভূত হয়। একজন সামান্য আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন জেলা প্রশাসকের কথা কল্পনা করুন: তার দ্বারা কতই না কল্যাণ সাধিত হবে– চারপাশের জনগণের। তেমনি একজন প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক বা শিক্ষিকার ক্ষেত্রেও: সামান্য আধ্যাত্মিক শক্তি তার মধ্যে এলে সে একজন শিশু সেবক বা শিশু সেবিকায় পরিণত হবে, শিশুদের দেখভাল করবে, লেখাপড়া শেখাবে, দেশের সুনাগরিক হিসেবে তাদের গড়ে তুলবে। সরকারি দপ্তরের একজন কেরানির ক্ষেত্রেও ঐ কথা, রাস্তায় পুলিশ-কনস্টেবলের ক্ষেত্রেও তাই এবং সরকারি পদাধিকারীর ক্ষেত্রেও তাই। এরা যদি একটু আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন হয়ে উঠে তবে সমাজে এক বিরাট পরিবর্তন আসতে পারে। এই সব উচ্চতর প্রেরণা আসে কেবল একটি মাত্র উৎস থেকে, তা হলো: আত্মবলম্ বা যোগবলম্, যা বুদ্ধিবলকে অনুপ্রাণিত করবে। বুদ্ধি সংশুদ্ধ হয় মানব ব্যক্তিত্বের গভীরতর স্তর থেকে উৎসারিত আধ্যাত্মিক শক্তির দ্বারা। আর বেদান্তের মতে এটি মানবজাতির পক্ষে একটি সার্বজনীন বৈশিষ্ট্য।